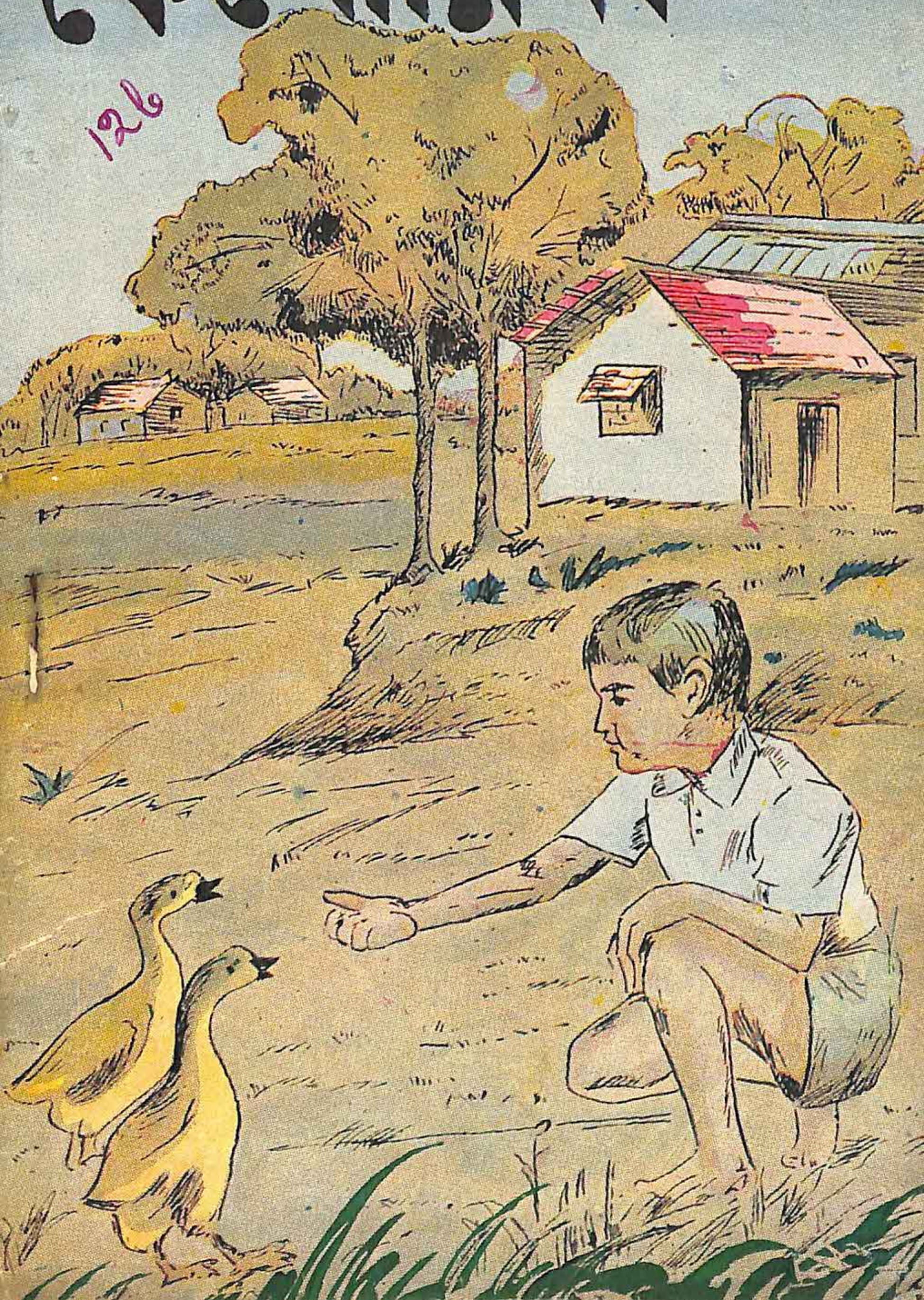
কৈশোরিকা

126



Recomended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII. Vide T. B. No. 76/7/TB/87, Dated 24. 11. 76

কৈশোরিকা

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

ডক্টর মুরারি মোহন সেন

উপনিষৎ-কাব্য-বেদ-ব্যাকরণ তীর্থ

প্রাক্তন রীডার, বাঙলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ-বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীগৌরীশংকর পাঠক, বি এ. (অনার্স) বি. টি.

সহ-শিক্ষক খাতড়া হাই স্কুল, বাঁকুড়া

প্রাক্তন শিক্ষক, অম্বিকানগর হাই স্কুল

ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন

৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা৮০০০০৯

প্রকাশক :
প্রতুলচন্দ্র ঘোষ
~~ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন~~
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

সংশোধিত সংস্করণ, ডিসেম্বর—১৯৮৩

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

কৈশোরিকা

প্রথম কবিতা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক ও বিষয় পরিচিতি ঃ—[জন্ম ১৮৬১ খৃীঃ মৃত্যু ১৯৪১ খৃীঃ। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৯১৩ খৃীঃ তিনি সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে। বোলপুরে (বীরভূম) শান্তিনিকেতনে তিনি বিশ্বভারতী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের নির্বাচিত অংশবিশেষ। জীবনে প্রথম কবিতা লেখার কৌতুককর অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে এই রচনায়।]

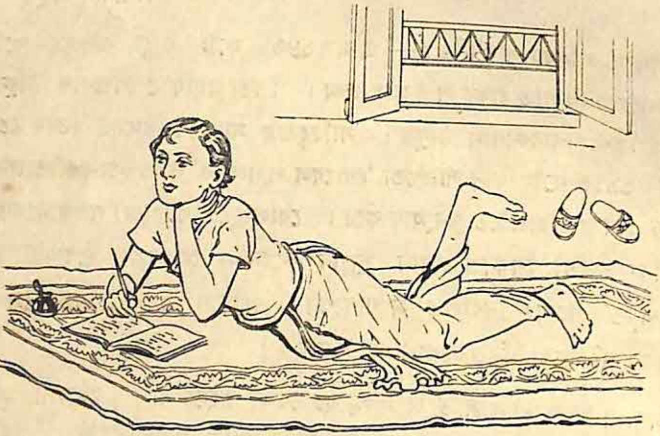
আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশী হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যামলেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মত শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।' বলিয়া পয়ার-ছন্দে চোদ্দ অক্ষরের যোগাযোগের রীতি-পদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

পদ্য জিনসটিকে এ পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবাচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্ত্যজনোচিত দুর্বলতার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে একথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না।

একদিন আমাদের বাড়ীতে চোর ধরা পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অথচ নিরতিশয় কৌতূহলের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, নিতান্তই সে সাধারণ মানুষের মতো। এমন অবস্থায় দারোয়ান যখন তাহাকে মারিতে সুরু করিল, আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল।

পদ্য সম্বন্ধেও আমার সেই দশা হইল। গোটাকয়েক শব্দ নিজের

হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্য-রচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিঁকিল না। এখন দেখিতেছি, পদ্য বেচারার উপরেও মার সয় না। অনেক সময় দয়াও হয়, কিন্তু মারও ঠেকানো যায় না, হাত নিশপিশ করে। চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই।



ভয় যখন একবার ভাঙ্গিল তখন মার ঠেকাইয়া রাখে কে? কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা সংগ্রহ করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া, কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম।

হরিণ শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত, আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।

মনে আছে, একদিন একতলায় আমাদের জমিদারি-কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় তখনকার 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া কহিলেন—"নবগোপাল বাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন না।"

শুনাইতে বিলম্ব হইল না।

কাব্য গ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারী হয় নাই, পকেটে পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক এই তিনে এক, একে তিন হইয়াছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন। পদ্মের উপরে একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেটা দেউড়ির সামনে দাঁড়াইয়াই উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—'বেশ হইয়াছে, কিন্তু ঐ 'দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কি'?

দ্বিরেফ এবং ভ্রমর দুটোই তিন অক্ষরের কথা। ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোন অনিষ্ট হইত না। ঐ দুরূহ কথাটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মনে নাই। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে ঐ শব্দটার উপরেই আমার আশা ভরসা সবচেয়ে বেশি ছিল। দফ্‌তরখানার আমলা মহলে নিশ্চয়ই ঐ কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। কিন্তু নবগোপাল-বাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারিল না। এমন কি তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নবগোপালবাবু সমঝদার লোক নহেন; তাঁহাকে আর কখনও কবিতা শুনাই নাই।

তাহার পরে আমার বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু কে সমঝদার, কে নয়—তাহা পরখ করিবার প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

যাই হউক, নবগোপালবাবু হাসিলেন বটে, কিন্তু 'দ্বিরেফ' শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

ক) মূল বক্তব্য :—ভাগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে পয়ার ছন্দে কবিতা লেখার অনুরোধ করলে রবীন্দ্রনাথ একখানা নীল কাগজের খাতা সংগ্রহ করে কবিতা রচনা শুরু করলেন। 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের সম্পাদক নবগোপালবাবুকে এই কবিতা শোনার অনুরোধ জানান হলো। তিনি খুশী হলেন কবিতা পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন করলেন, কবিতার দ্বিরেফ শব্দটার অর্থ কি? রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল এত সুন্দর অর্থ থাকতে এই শব্দটার প্রতি নবগোপাল বাবুর আকর্ষণ কেন? তাই তিনি মনে করেছিলেন নবগোপালবাবু সমঝদার লোক নন্।

(খ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

১। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা রচনার কাহিনী নিজের ভাষায় বল।

২। কবি কবিতা রচনার কাহিনী বলতে চোরের কথা আনলেন কেন, তা বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। "চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই" —কে কোন্ প্রসঙ্গে বলেছে ? উল্লিখিত মন্তব্যের যাথার্থ্য নির্ণয় কর।

২। হরিণ শিশুর নূতন শিং বার হওয়ার সঙ্গে লেখক কার তুলনা করেছেন এবং কেন ?

৩। রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে কে সব থেকে গর্ব অনুভব করতেন ? তিনি কি করতেন ?

৪। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কাকে শুনান হয়েছিল ? তিনি কে ? কবিতা পড়ে তিনি কি মন্তব্য করেছিলেন ?

৫। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কোন্ শব্দ দুটির উপর আশা ভরসা ছিল বেশী ?

(গ) **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

১। এখন দেখিতেছি, পদ্য বেচারার উপরেও মার সয় না।

২। চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই।

৩। হরিণ শিশুর নূতন শিং ·····উৎপাত আরম্ভ করিলাম।

৪। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে ঐ শব্দটার উপরেই······বেশী ছিল।

(ঘ) **শব্দার্থ :**—পয়ার—বাঙলার একটি ছন্দের নাম। প্রত্যেক লাইনে বা চরণে চোদ্দটি অক্ষর থাকে—দুই লাইনে মিল থাকে। আর প্রতি লাইনে ৮ অক্ষরের পর একটু যতি অর্থাৎ থামবার জায়গা থাকে।

দ্বিরেফ—দুই রেফ (র) যাতে অর্থাৎ যে বাচক শব্দে দুই 'র'—যেমন ভ্রমর, মধুকর।

স্বগত উক্তি—আপন মনের কথা।

দুরূহ—কঠিন।

Rabindranath's curious experience of composing poems in Childhood days.

প্রফুল্ল

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক ও বিষয়-পরিচিতি ঃ—[জন্ম—১৮৩৮ খ্রীঃ, মৃত্যু—১৮৯৪ খ্রীঃ, নৈহাটীর কাঁটালপাড়া গ্রামে। হুগলী কলেজে ছাত্রাবস্থা হতেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হলো—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি। প্রবন্ধ সাহিত্যেও তিনি অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। আলোচ্য রচনাটি দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত।]

প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, "এখন কি করি? কোথায় যাই? এ নিবিড় জঙ্গল ত থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কি প্রকারে? যাই বা কোথায়? বাড়ী ফিরিয়া যাইব? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কি প্রকারে? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে, জানাজানি, হইবে, চোর ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায়? যাহাকে পাইব তাহাকেই বা বিশ্বাস কি? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ? এ ধনের রাশির লোভ কে সম্বরণ করিবে?"

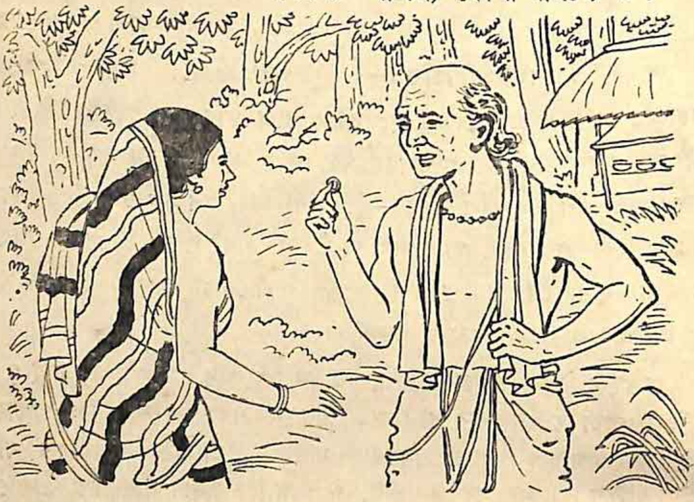
প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল, "অদৃষ্ট যাহাই হৌক দারিদ্র্য দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এ জঙ্গলে তফাৎ কি? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখানেও না হয় তাই করিবে।"

এইরূপ মনস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহ-কর্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘরদ্বার পরিষ্কার করিল। গোরুর সেবা করিল। শেষ রন্ধনের উদ্যোগ। রাঁধিবে কি? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল।

এ জঙ্গলে হাট কোথায়; প্রফুল্ল ভাবিল, "সন্ধান করিয়া লইব।" জঙ্গলে পথের রেখা আছে, প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ

হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, 'কোথা যাইবে, মা ?'



প্রফুল্ল। আমি হাটে যাইব।

ব্রাহ্মণ। এদিকে হাটের পথ কোথা ?

প্রফুল্ল। তবে কোন দিকে ?

ব্রাহ্মণ। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?

প্রফুল্ল। এই জঙ্গল হইতেই।

ব্রাহ্মণ। এই জঙ্গলে তোমার বাস ?

প্রফুল্ল। হাঁ।

ব্রাহ্মণ। তবে তুমি হাটের পথ চেন না ?

প্রফুল্ল। আমি নতুন আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণ। এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্বক আসে না। তুমি কেন আসিলে ?

প্রফুল্ল। আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রাহ্মণ। হাট একবেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর ডাকাইতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে ?

প্রফুল্ল। আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ প্রফুল্লের মুখ পানে চাহিয়া দেখিল। মনে মনে বলিল, "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাউক ব্যাপারটা

কি ?” প্রকাশ্যে বলিল, “তুমি একা হাটে যাইও না। বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে। যদি ইচ্ছা হয় তবে সেখান হইতে চাল, দাল কিনিতে পার।”

প্রফুল্ল বলিল, “সেই ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত দেখিতেছি।”

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকম আছে। বাছা! তুমি আমার সঙ্গে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরও নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই ? দেখিল, সেখানে একখানি কুটীর আছে— তালা চাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালা খুলিল। প্রফুল্ল দেখিল,— দোকান নয়, তবে হাঁড়ি, কলসী, চাল, ডাল, নুন, তেল যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার লইয়া যাও।”

প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, “দাম কত দিতে হইবে ?”

ব্রাহ্মণ। এক আনা।

প্রফুল্ল। আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রাহ্মণ। টাকা আছে ? দাও ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।

প্রফুল্ল। আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রাহ্মণ। তবে কি নিয়া হাটে যাইতেছিলে ?

প্রফুল্ল। একটি মোহর আছে।

ব্রাহ্মণ। দেখি।

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল ; বলিল, “মোহর ভাঙ্গাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।”

প্রফুল্ল। ঘরেও পয়সা নাই।

ব্রাহ্মণ। সবই মোহর ! তা' হোক, চল, তোমার ঘর চিনিয়া আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন “সবই মোহর” কথাটা প্রফুল্লের কানে ভাল লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে। আর সেই লোভেই তাহার বাড়ী দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল

জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল তাহা রাখিল। বলিল, "আমাকে হাটেই যাইতে হইবে আমার কাপড় চোপড়ের বরাৎ আছে।"

ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, "মা! মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ী চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিবা লইব? তা তুমি কি মনে করিয়াছ, হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে?"

সর্বনাশ! প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।"

প্রফুল্ল স্পন্দহীন! ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্য স্ফূর্তি হইল না।

ভবানী বলিল, "বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।" এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা দামামা বাহির করিয়া, তাহাতে গোটাকতক ঘা দিল। মুহূর্ত মধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মত জওয়ান লাঠি সড়কি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আজ্ঞা হয়?"

ভবানী বলিল, "এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মার মত দেখিবে। তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।" এই বলিবামাত্র দস্যুদল মুহূর্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি; একবারেই বুঝিল যে, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, "চলুন, আপনাকে বাড়ী দেখাইতেছি।"

প্রফুল্ল দ্রব্য সামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে চলিল, ভবানী পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া, ভবানী ঠাকুরকে বসিতে, প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল।

॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূল বক্তব্য :**—[প্রফুল্ল কৃষ্ণদাস প্রদত্ত ধনরত্ন নিয়ে বনে থাকার স্থির করলেন কারণ তাঁর কাছে গৃহ ও অরণ্য একই। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনার জন্য একটি মোহর নিয়ে বাহিরে গেলে পথে দস্যু সর্দার ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেখা হয়। ভাবানী পাঠক প্রফুল্লের সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পারলেন মেয়েটি বুদ্ধিমতী এবং তাঁর কাছে প্রচুর ধনরত্ন আছে। ভবানী পাঠকও প্রফুল্লের যাতে কোন অনিষ্ট না হয়, তারজন্য দামামা বাজিয়ে সঙ্গীদের জড়ো করে নির্দেশ দিলেন - একে তিনি মা বলেছেন, তাঁর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। প্রফুল্ল বিস্মিত হলেন, তিনি বুঝতে পারলেন এর শরণাগত হওয়া ভিন্ন পথ নেই।]

(খ **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**—

১। ভবানী পাঠকের সঙ্গে প্রফুল্লের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি বর্ণনা কর।

২। ভবানী পাঠকের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

। প্রফুল্ল চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

(গ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**—

১। "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকমের আছে"—কে কাকে এই কথা বলেছেন? এই কথার তাৎপর্য কি?

২। দস্যুসর্দার প্রফুল্লকে মাতৃসম্বোধন করলেন কেন?

৩। "সবই মোহর" কথাটি কে বলেছেন? কথাটি প্রফুল্লের কানে ভাল ঠেকে নি, কেন তা আলোচনা কর।

(ঘ) **ব্যাখ্যা মূলক প্রশ্ন :**-

১। "সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখানেও না হয় তাই করিবে।"

২। "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাউক ব্যাপারটা কি?"

৩। "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকম আছে। বাছা!"

ঙ) **শব্দার্থ :**—ভাতিয়া—ঝলসে যাওয়া, **অবিচ্ছিন্ন**—যার মধ্যে ছেদ নেই। পার্বতী—পর্বত হতে জাত। প্রতারণা—বঞ্চনা, স্থিরবুদ্ধি—যার বুদ্ধি কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয় না। শরণাগত—আশ্রিত।

(চ **বাক্য রচনা কর** :—সিদ্ধান্ত, ইচ্ছাপূর্বক, প্রকাশ্যে, বরাং।

(ছ। শব্দার্থ লেখ :—অলৌকিক স্পন্দনহীন, বাক্যস্ফূর্তি।

(জ) একার্থক শব্দ লেখ :—রেখা, দস্যু, অন্তর্হিত, বিস্মিত।

(ঝ) **শুদ্ধ করে লেখ :**—দরীদ্র, পরিস্কার, বাক্যস্ফূর্তি, মুহূর্ত, অন্তহীত।

Story of an intelligent and Courageous village girl.

ন্যায়পরায়ণতা

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক ও **বিষয়পরিচিতি** :—[জন্ম—১৮২০ খৃীঃ, মৃত্যু—১৮৯১ খৃীঃ। মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে জন্ম। বাংলা গদ্যকে মার্জিত ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর দান অবশ্যই স্বীকার্য। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এদেশের সমাজ হতে কুপ্রথা দূর করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। 'আখ্যান মঞ্জরী' প্রথম ভাগ হতে আলোচ্য গল্পটি সংকলিত হয়েছে।]

ইংলণ্ডদেশে লেনার্ড নামে এক বালক ছিল। সে অতি দুঃখীর সন্তান। তাহার পিতা অতিকষ্টেই সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রমে লেনার্ডের পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার জননীর এরূপ পরিশ্রমশক্তি ছিল না যে, তিনি আপনার ও পুত্রের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত অর্থের উপার্জন করেন। লেনার্ড প্রতিজ্ঞা করিল, অন্য কাহারও গলগ্রহ হইব না ; এবং ভিক্ষা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি দ্বারাও জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করিব না ; যেরূপে পারি, পরিশ্রম দ্বারা আপনার ও জননীর ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

এইরূপ সংকল্প করিয়া, লেনার্ড মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি একপ্রকার লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি ; যদি আমি সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী হই, কেনই বা আমি জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত অর্থোপার্জনে সমর্থ হইব না ? এই স্থির করিয়া, জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সে এক সন্নিহিত নগরে উপস্থিত হইল। ঐ নগরে তাহার পিতার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম বেনসন্। তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, এবং বাণিজ্য করিতেন। লেনার্ড তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন অবস্থা জানাইল এবং নিতান্ত কাতর ও বিনীতভাবে প্রার্থনা করিল, আপনি কৃপা করিয়া আমায় আপনার আশ্রয়ে রাখুন ; এবং আমাদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও কর্মের ভার দিউন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কার্য সম্পাদন করিব ; প্রাণান্তেও অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না।

দৈবযোগে ঐ সময়ে বেনসনের একটির সহকারী নিযুক্ত করিবার

প্রয়োজন ছিল। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা অপেক্ষা, বন্ধুপুত্র লেনার্ডকে নিযুক্ত করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, তিনি আহ্লাদপূর্বক তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। লেনার্ড, স্বভাবতঃ সুশীল সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ ; কর্মে নিযুক্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল এবং সৎপথে থাকিয়া যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, সুন্দররূপে কার্য নির্বাহ করিতে লাগিল। যদি দৈবাৎ কখনও আবশ্যক কর্ম করিতে বিস্মৃত হইত, অথবা ভ্রান্তিক্রমে কোনও কর্ম প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিত, সে তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করিত এবং যথাশক্তি সেই দোষের সংশোধনে যত্নবান্ হইত।

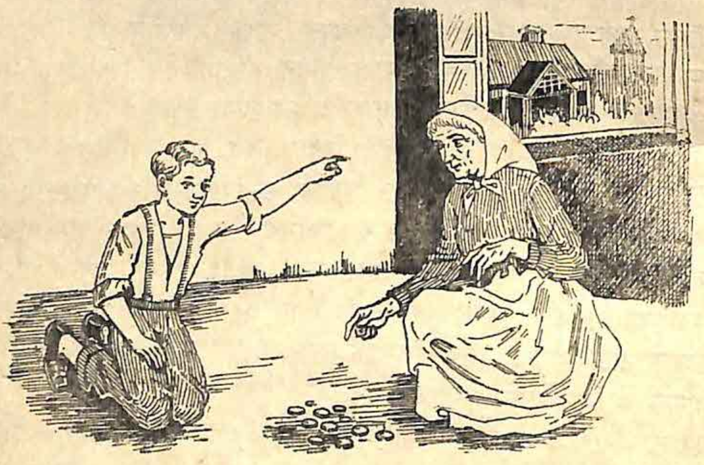
লেনার্ডের সুশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে, বেন্‌সন্ তাহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ও তাহার হস্তে সকল বিষয়ের ভার দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে সে বিষয়কর্মে নিপুণ এবং স্বীয় প্রভুর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল।

বেন্‌সনের স্ত্রী-পুত্র আদি পরিবার ছিল না। তিনি একটি স্ত্রী-লোকের হস্তে, সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বয়ং কখনও কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত বা কোনও বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন না। ঐ স্ত্রীলোকের ধর্মজ্ঞান ছিল না ; সুতরাং সে সুযোগ পাইলেই অপহরণ করিত। এক্ষণে লেনার্ডের উপর প্রভুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ দেখিয়া, সে বিবেচনা করিল, এ বালক এখানে থাকিলে আমার লাভের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে ; এবং হয়ত, অবশেষে অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া, এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। অতএব কৌশল করিয়া ইহাকে এস্থান হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক, তাহা না হইলে আমার পক্ষে ভদ্রস্থতা নাই।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই স্ত্রীলোক অবসর বুঝিয়া, একদিন বেন্‌সনের নিকট কৌশল করিয়া বলিতে লাগিল—মহাশয়, আপনি অতি সদাশয়, সকলকেই সজ্জন ভাবেন। আপনি এই বালকের উপর অধিক বিশ্বাস করিবেন না। আপনি উহাকে যত সুশীল ও সচ্চরিত্র মনে করেন ও সেরূপ নহে। আমি বহুকাল আপনকার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছি। আপনার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া সতর্ক না করিলে আমার অধর্ম হইবে। এজন্য আমি অনেক বিবেচনা করিয়া আপনাকে এ বিষয় জানাইলাম।

এই স্ত্রীলোকের উপর বেন্‌সনের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু লেনার্ড যে অতিশয় সুশীল ও সচ্চরিত্র সে বিষয়েও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় ছিল না। এই জন্য তিনি স্ত্রীলোকের কথায় সহসা বিশ্বাস না করিয়া বিবেচনা করিলেন, আমি কৌশল করিয়া এই বালকের চরিত্র পরীক্ষা করিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বেন্‌সন একদিন লেনার্ডকে বলিলেন, আমার এই এই বস্তুর অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে; যে মূল্যে হয়, সত্বর কিনিয়া আন। এই বলিয়া, যত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা তাহার হস্তে দিয়া, তিনি তাহাকে আপণে পাঠাইয়া দিলেন। লেনার্ড ঐ সকল জিনিস কিনিয়া অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করিল; এবং ক্রীত বস্তু সকল প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া মূল্যাবশিষ্ট টাকা তাহার হস্তে দিল। লেনার্ড



এ বিষয়ে এক কপর্দকও আত্মসাৎ করে নাই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া তিনি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন; এবং ঐ স্ত্রীলোক যে কেবল বিদ্বেষ-বশতঃ তাহার গ্লানি করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

একদিন অসাবধানতাবশতঃ কার্যালয়ে কতকগুলি মোহর ফেলিয়া গিয়াছিলেন। লেনার্ড তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোহর পড়িয়া আছে। সেই সময় ঐ স্ত্রীলোকও সেস্থানে উপস্থিত হইল। সে লোভে আক্রান্ত হইয়া তাহার নিকট প্রস্তাব করিল—আইস, আমরা উভয়ে এই মোহরগুলি ভাগ করিয়া লই। লেনার্ড বলিল, আমি এ মোহর প্রভুর হস্তে দিব। ইহা তাঁহার সম্পত্তি; পরস্বহরণ অতি গর্হিত কর্ম।

বিশেষতঃ তিনি আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন ; এমন স্থলে এ মোহর আত্মসাৎ করিলে, আমায় বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে।

এই বলিয়া মোহর লইয়া লেনার্ড বেন্‌সনের নিকট উপস্থিত হইল এবং সকল কথা বলিয়া মোহরগুলি তাঁহার হস্তে দিল। বেন্‌সন লেনার্ডের ঈদৃশ অবিচলিত ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে নিরতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিলক্ষণ পুরস্কার দিলেন।

ক্রমে ক্রমে এই বালকের উপর তাঁহার এরূপ স্নেহ জন্মিল যে পরিশেষে তিনি তাহাকে পুত্রবং পরিগৃহীত করিয়া স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলেন।

॥ **পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী** ॥

(ক) **মূল বক্তব্য** :—[লেনার্ড নামে একটি বালক ছিল, সে ইংলণ্ডের অধিবাসী। ১২ বছর বয়সে তার পিতার মৃত্যু হলে সে বড়ই বিপদে পড়ে। ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ না করে সে পরিশ্রমের মাধ্যমে সংসার চালাবার মনস্থ করে এবং তার পিতার ধনী বন্ধু বেন্‌সনের সঙ্গে দেখা করে। বেন্‌সনের ছেলেটী দেখে খুব পছন্দ হয় এবং তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন। কাজ ও কর্মের মধ্য দিয়ে সে তাঁর বিশেষ প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলে বেনসনের দাসী ভাবল তার অর্থ মারার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সে লেনার্ডের নামে আজেবাজে কথা বলে বেনসনের কান ভারী করে তুলল। বেনসন কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য লেনার্ডকে নানা রকম পরীক্ষা করল কিন্তু লেনার্ড প্রতিবারই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। তখন তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি লেনার্ডকে দিয়ে দিলেন।]

(খ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন** :—

১। লেনার্ডের চরিত্র সম্পর্কে তোমার যে ধারণা হয় তা বল।

২। বেন্‌সনের চরিত্র আলোচনা কর।

৩। বেন্‌সনের দাসী কেমন মহিলা ছিলেন ?. তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর।

(গ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** :—

১। গল্পটি পড়ে কি উপদেশ পেলে ?

২। "আমি কৌশল করিয়া এই বালকের চরিত্র পরীক্ষা করিব"।—কে কার সম্পর্কে এই উক্তি করেছেন ? কখন ?

৩। "পরস্বহরণ অতি গর্হিত কর্ম"—কে কাকে বলেছিল? কেন বলেছিল?

৪। বেন্‌সন কেন লেনার্ডকে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন?

(ঘ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। "আমি জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত অর্থোপার্জনে সমর্থ হইব না"।

২। "এ মোহর আত্মসাৎ করিলে আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে"।

(ঙ) শব্দার্থ :—গলগ্রহ—গলার ভার স্বরূপ; সন্নিহিত—নিকটবর্তী; সঙ্গতিসম্পন্ন—ধনশালী; অঙ্গীকার—প্রতিজ্ঞা, অপহরণ—চুরি, তত্ত্বাবধানে—খোঁজখবর; ভদ্রস্থতা—মঙ্গল; অণুমাত্র—বিন্দুমাত্র; আপণে—দোকানে; কপর্দক—কড়ি; গর্হিত—নিন্দনীয়; বিলক্ষণ—প্রচুর; পরিগৃহীত করিয়া—গ্রহণ করিয়া।

(চ) বাক্য রচনা কর :—যথাশক্তি, যত্নবান, অনবধানতা, বিবেচনা।

(ছ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—সচ্চরিত্র, প্রত্যাগমন, অর্থোপার্জন

(জ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :—পুরস্কার, সঙ্গতিপন্ন, বিশ্বাস।

(ঝ) শুদ্ধ করে লেখ :—ভরনপোষণ, জিবীকা, বিলক্ষন, প্রার্থণা।

Story of an honest and munavar-cious boy.

শিলঙ

— চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক ও বিষয়-পরিচিতি :—[বাংলা সাহিত্য জগতে চারুচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট নাম। ভ্রমণ কাহিনী মূলক রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এই রচনাটিও একটি ভ্রমণ কাহিনী মূলক।

আসামের মত বিচিত্র সৌন্দর্য্য কোথাও দেখি নাই। শিলঙের পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, পথটি ক্রমশঃ উঁচু হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া প্রশান্ত ও পরিচ্ছন্ন পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—দেখিতে একখানি ছবির মতন। এধারে পাহাড়—পাহাড়ের গায়ে সবুজ শৈবাল জন্মিয়া, যাহা কিছু রুক্ষ ও নীরস ছিল—সমস্তকে স্নিগ্ধ ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। কোন স্থানে পাহাড়ের গা বাহিয়া ছোট ছোট ঝরণা আসিয়া নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। উহার স্বচ্ছ ধবধবে সাদা ফেনিল জল অনবরত ছুটিয়া চলিয়াছে। রাস্তার অপর পার্শ্বে পর্বতগাত্র একেবারে সমতল মাটির সঙ্গে মিশিয়াছে। বড় বড় সরল গাছ সেই ঢালু পর্বতগাত্রকে আগাগোড়া আবৃত করিয়া মাথা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নীচের শীর্ণকায়া পার্ব্বতী নদী ঝরণার শুভ্র ফেনিল বারিরাশি লইয়া গভীর গর্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর সেরূপ অবিশ্রান্ত গতি, এমন নৃত্য, এমন ফেনিল তরঙ্গ ভঙ্গ আর দেখি নাই।

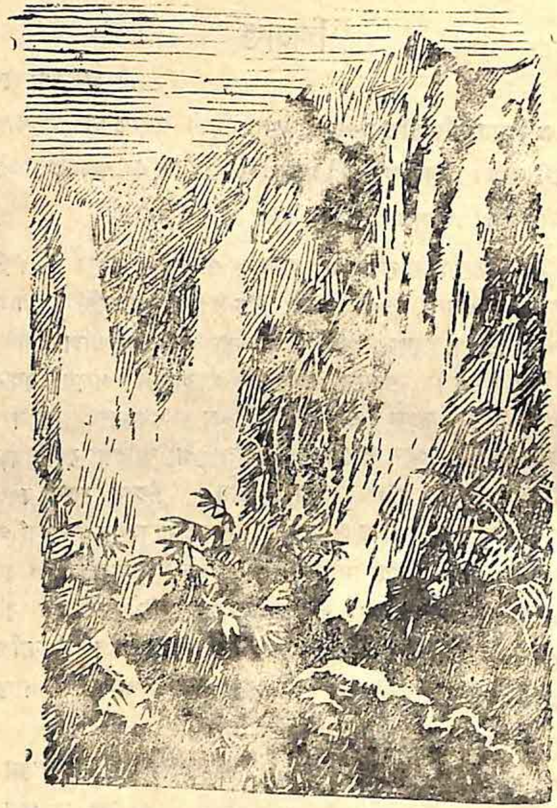
শিলঙের জলপ্রপাতগুলি দেখিবার মত জিনিষ। 'বিডন ফল'টিই প্রথম দেখিতে যাই। শহরের বাহিরে আসিয়া পাহাড়ের যে পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে, সেই পথে হাঁটিয়া নীচে নামিলাম - ঠিক যেখানে ঝরণাটি আসিয়া পড়িতেছে সেই জায়গায় দাঁড়াইলাম!

ছোট বড় নানা আকারের পাথর ডিঙাইয়া নানাধারায় শুভ্র ফেনিল জলরাশি ঢলিয়া পড়িতেছে।

সে এক অপূর্ব শোভা!

উপর হইতে জলধারা নামিতেছে—তাহারই সামনে একটা উঁচু পাথরে দাঁড়াইয়া এক মুক্তধারা দেখিতে লাগিলাম। বিন্দু বিন্দু জল ছিটকাইয়া গায়ে আসিয়া পড়িতেছিল। কিছু দূরে নামিয়া ঝরণাটি গাছ-গাছড়ায় ভরা ছায়াশীতল কুঞ্জের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। রৌদ্রের সময় এমন আরামপ্রদ ঠাঁই কোথায় আছে?

'বিডন ফল' দেখিয়া খানিকটা উপরে উঠিয়া বনজঙ্গলে আবৃত শিশির ভেজা আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা ধরিয়া 'বিশপ ফলের' দিকে চলিলাম।



বেলা তখন প্রায় দশটা হইবে।

কিছু আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের আড়ালে গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন পাথরকাটা সরু পাহাড়িয়া পথটি তখনও পিছল ছিল। দক্ষিণে একেবারে অতল গভীরতা, পড়িলে বাঁচিবার আশা নাই।

সেই রাস্তায় হাতড়াইতে হাতড়াইতে উপরে গিয়া উঠিলাম। যেই উপরে উঠিয়াছি, অমনি মুখের উপর মধ্যাহ্ন রবির দীপ্ত কিরণ ভাতিয়া উঠিল। গভীর গর্জনে 'বিশপ প্রপাত' চোখের সামনে বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল। সেই শতশত ফিট্ উঁচু হইতে একটা অবিচ্ছিন্ন জলধারা একেবারে সোজাসুজিভাবে নামিয়া পড়িতেছে। একদৃষ্টিতে এ ধারার অর্ধেকের

বেশী দেখা যায়না ; শাদা ধবধবে জলরাশি অবিশ্রান্ত গতিতে পড়িতেছে—এ গতির শেষ নাই। কত যে জল পাষাণময় স্তূপের ভিতর জমা আছে কে জানে ?

একেবারে নীচে—যেখানে জল নামিয়া পড়িতেছে, সেখানে একটা ঘূর্ণিপাক খাইয়া এই বিরাট জলরাশি তোলপাড় করিতেছে। ঘাসে ঢাকা সেই স্থানটুকুতে বসিয়া বসিয়া এই শোভা অনেকক্ষণ প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। তারপর ধীরে ধীরে একটি সরুপথ দিয়া বহুক্লেশে উপরে উঠিতে লাগিলাম।

প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে শিলঙে প্রচুর পরিমাণে ফল ফুল জন্মে। এখানকার বৃক্ষলতার যেমন বৃদ্ধি—তেমনি শ্রী সৌষ্ঠব। দার্জিলিঙের প্রকৃতির মধ্যে একটা বন্য উচ্ছৃংখলতা আছে—শিলঙের প্রকৃতির শ্রীগৌরবের মধ্যে বেশ একটা শৃংখলা ও পারিপাট্য দৃষ্ট হয়। এখানে দার্জিলিঙের মত অসহ্য শীতও নাই।

শিলঙের প্রাকৃতিক শ্রীভাণ্ডারে মানুষের বুদ্ধি বেশ একটু গৃহিণীপনা করিয়াছে। এখানকার খেলার মাঠ, ছায়ায় ভরা পথগুলি, ছবির মত সুদৃশ্য সবুজ বনে ঘেরা সুন্দর 'লেক', নানাবর্ণের অর্ধবন্য পুষ্পে ভরা বৃক্ষবাটিকাগুলি, স্তরে স্তরে সজ্জিত ঘরবাড়ীগুলি সমস্তই ঐ গৃহিণী-পনার পরিচয় দান করিতেছে। শিলঙের কথা আর অধিক না লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের 'শিলঙের চিঠি' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি—

'এখানে খুব লাগলো ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন পাতার গন্ধ বয়!
বেশ আছি এই বনে বনে যখন তখন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখী নাচে, শিষ দিয়ে গায় বুলবুলি।
ভালো লাগে দুপুর বেলায় মন্দ মধুর ঠাণ্ডাটি।
ভোলায় রে মন দেবদারু বন—গিরিদেবের পাণ্ডাটি!
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আঁককাটা।
দিব্য দেখায়, শৈলবুকে শস্যক্ষেতের থাককাটা।
ভালো লাগে, রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দীতে
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল সোনালির সন্ধিতে।
—(সংক্ষেপিত)

॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥

(ক) মূল বক্তব্য :—[প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় শিলঙ্ একটি সুন্দর স্থান। এর প্রকৃতিতে যে শৃঙ্খলা রয়েছে তা কিন্তু দার্জিলিং-এর প্রকৃতিতে নেই। এর নিসর্গ সৌন্দর্যের মধ্যে যেন গৃহিণীপনার ভাব রয়েছে। এই ভাব যে কোন ভ্রমণকারীর দৃষ্টিতে পড়বেই। শিলঙ্-এর জলপ্রপাতগুলি দেখবার মত জিনিস। তাদের দৃশ্য অপূর্ব। শুধু জলপ্রপাত কেন ফুলের সমারোহে প্রকৃতি নবরূপ ধারণ করে। এখানেও প্রকৃতির গৃহিণীপনা লক্ষ্য করা যায়]।

(খ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। শিলঙ্ এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

২। বিশপ প্রপাতের বর্ণনা দাও।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—

১। শিলঙ্ এ গেলে কোন্ জলপ্রপাতটি প্রথমে দেখতে পাওয়া যায় ?

২। বিশপ ফল কি ? এর সৌন্দর্য কেমন ?

৩। শিলঙ্-এর খেলার মাঠ ও পথগুলি কেমন ?

(ঘ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। শিলঙের প্রাকৃতিক শ্রীভাণ্ডারে মানুষের বুদ্ধি বেশ একটু গৃহিণীপনা করেছে।

২। "এ গতির শেষ নাই"।

৩। "দক্ষিণে একেবারে অতল গভীরতা, পাড়লে বাঁচিবার আশা নাই"।

৪। "কত যে জল পাষাণের স্তূপের ভিতর জমা আছে কে জানে"।

(ঙ) শব্দার্থ :—সম্বরণ—দমন ; নিবিড়তর—আরও অধিক ঘন ; বরাৎ—কাজের ভার, প্রতারণা—ছলনা ; প্রত্যক্ষ—চোখের সামনে : অন্তর্হিত—অদৃশ্য।

(চ) বাক্যরচনা কর :—ফেনিল, সমতল, পাহাড়িয়া, ছায়াশীতল, অবিচ্ছিন্ন

(ছ) শুদ্ধ করে লেখ :—মধ্যাহ্ন, ঘূর্ণিপাক, স্তূপ।

Description of natural beauty of Shilong.

একটি আবিষ্কার

বিশ্বপতি চৌধুরী

লেখক ও বিষয়-পরিচীত ঃ—[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক ও সুসাহিত্যিক। বিভিন্ন রচনার মধ্যে তাঁর উল্লেখ্য রচনা "কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসে সেই প্রাচীন অধ্যায়টি লেখক এখানে তুলে ধরেছেন]।

আজকাল সন্ধ্যার পর শহরে যে-দিকেই চাও, দেখিবে ইলেকট্রিক আলোর ছড়াছড়ি।

কিন্তু একদিন ছিল, যখন এই বিজলিবাতির নামও কেহ জানিত না। তখন ইহার বদলে গ্যাসের আলো জ্বলিত।

এই গ্যাসের আলো যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম উইলিয়াম মারডক্।

মারডকের পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কাজেই লেখাপড়ায় তিনি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। স্কটল্যাণ্ডের এক নগণ্য পল্লীতে তাঁহারা বাস করিতেন। বালক মারডক্‌কে সারাদিন পাহাড়ে গরু চরাইয়া বেড়াইতে হইত। ইহার মধ্যে যেটুকু অবসর পাইতেন, ছোট-খাটো কলকব্জা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি হাতে তৈয়ারী করিয়া তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন।

এইভাবে দিন যায়।

হঠাৎ একদিন মারডকের খেয়াল হইল, তিনি শহরে গিয়া কোন কারখানায় ভর্তি হইবেন।

বার্মিংহামে একটা প্রকাণ্ড কারখানা ছিল। এই কারখানার মালিকের সহিত বালক মারডক্ দেখা করিলেন।

বালক টুপীটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কারখানার মালিক দু'চারটি প্রশ্ন করিতেই বালকের হাত হইতে টুপীটি খসিয়া পড়িল। কারখানার মালিক লক্ষ্য করিলেন, টুপীটি মাটিতে পড়ায় একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ হইল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—'টুপী তো সোলার হয়, এ কিসের তৈরী বল তো?'

মারডক্ বলিলেন,—'আজ্ঞে, এ টুপী কাঠের তৈরী। এ আমি নিজেই তৈরী করেছি।'

রাত্রে বাসায় ফিরিয়া তিনি যন্ত্রপাতি লইয়া কাজে বসিয়া যান। কিন্তু আলোর অভাবে তাঁহাকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। মোমবাতি বা তেলের আলোয় এসব সূক্ষ্ম কাজ করা চলে না। ইহার একটি উপায় না করিলেই নয়। এই প্রথম মারডকের মাথায় নূতন রকম আবিষ্কারের চিন্তা জাগিল। অতঃপর তিনি তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া পরীক্ষা সুরু করিলেন। একদিন সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, ছেলেবেলায় এক ব্যক্তি কিসের ধোঁয়া জ্বালাইয়া তাঁহাদের ভেল্কি দেখাইয়াছিল।

মারডকের মন বলিল,—কয়লা লইয়াই তাঁহাকে পরীক্ষা শুরু করিতে হইবে। এই নূতন আলোকের সন্ধান কয়লার মধ্যে মিলিবে।

তাহার পর, আরম্ভ হইল অদম্য সাধনা।

একদিন তিনি একটা বন্ধ কেটলীর মধ্যে খানিকটা কয়লা পুরিয়া তাহাতে উত্তাপ দিতে লাগিলেন। কেটলীর নলের মুখে একটা লম্বা রবারের নল লাগাইয়া দেওয়া হইল। এই নলের সাহায্যে কয়লার ধোঁয়া



একটা ধাতু নির্মিত পাত্রে গিয়া সঞ্চিত হইতে লাগিল। এই পাত্রে আর একটি নল লাগানো হইল। এই নলের মুখে একটা ছোট ঠুলি পরানো ছিল। ঠুলিটার গায়ে ছোট্ট একটি ছিদ্র রাখা হইয়াছিল। এই সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়া পাত্রস্থ কয়লার ধোঁয়া বেগে বাহির হইতে লাগিল। মারডক

সেই ছিদ্রের মুখে আগুন ধরাইলেন। ধোঁয়া অমনি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে আলো যেমন তীব্র, তেমনি উজ্জ্বল।

তিনি সকলকে তাঁহার আবিষ্কারের কথা জানাইলেন ; সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

তিনি বলিলেন—"এখনি হয়েছে কি! এই আলো দিয়ে আমি সমস্ত শহরটাকে আলোকিত করব।"

এইবার সকলেই হাসিয়া উঠিল। লোকটা পাগল হইল নাকি! ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হামফ্রি ডেভি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"তার চেয়ে বলুন না কেন, চাঁদ থেকে কতকটা অংশ কেটে এনে লণ্ডনে ছেড়ে দেব।"

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের টিটকারী ও সাধারণের ঠাট্টাবিদ্রূপ মারডক্‌কে একটুকুও দমাইতে পারিল না।

ইহার কিছুকাল পরে, একদিন রাত্রে সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল, সত্যই গ্যাসের আলোকে লণ্ডন শহরের পথঘাট আলোকিত হইয়াছে।

॥ পাঠ্যসহায়ক ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূল বক্তব্য ঃ**—(মারডকের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু তাঁর জীবনে স্বপ্ন ও উচ্চাশা ছিল, তাই অবসর সময় সে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি তৈরী করার চেষ্টা করত। কিন্তু আলোর অভাবে তাকে বড় অসুবিধায় পড়তে হত। মোমের আলোতে এত সূক্ষ্ম কাজ করা চলে না। তাই সে কয়লা নিয়ে পরীক্ষা সুরু করল। অবশেষে পরীক্ষা সফল হল। গ্যাসের আলো আবিষ্কৃত হল।)

(খ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

১। উইলিয়াম মারডক্ কি আবিষ্কার করেছিলেন ? কিরূপে আবিষ্কার করেছিলেন আলোচনা কর।

(গ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১। উইলিয়াম মারডক্ কে ? তার পিতার অবস্থা কেমন ছিল ? তারা কোথায় বাস করত ?

২। মারডক্ কোথায় ভর্তি হওয়ার জন্য গেলেন ?

৩। মারডকের টুপিটা কিসের তৈরী। কে তৈরী করেছিল ?

৪। মারডক কি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন ?

৫। পরীক্ষার ফলাফল কি হলো ?

৬। সকলেই হেসে উঠল কেন ?

(ঘ) **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

১। 'এই প্রথম মারডকের মাথায় নূতন রকম আবিষ্কারের চিন্তা জাগিল'।

২। 'সে আলো যেমন তীব্র, তেমনি উজ্জ্বল'।

৩। 'তার চেয়ে বলুন না কেন, চাঁদ থেকে কতকটা অংশ কেটে এনে লণ্ডনে ছেড়ে দেব।'

(ঙ) **শব্দার্থ : সচ্ছল**—সঙ্গতিপন্ন অবস্থা ; **নগণ্য**—তুচ্ছ বা সামান্য ; **ভেল্কি**—যাদু ; **ভেল**—যা ভ্রান্তি জন্মায়।

(চ) **বাক্যরচনা কর :** সচ্ছল, খেয়াল, ভেল্কি, সঞ্চিত, উজ্জ্বল, টিটকারী, ঠাট্টাবিদ্রূপ, পথঘাট।

Description of a scientific ~~dis~~ invention.

শকুনির ডিম

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক ও বিষয়-পরিচিতি ঃ [জন্ম ১৮৯৪ খৃীঃ, মৃত্যু ১৯৬০ খৃীঃ। পৈতৃক বাসভবন ব্যারাকপুর। বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর খুব নাম। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরন্যক, দেবযান প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ। আলোচ্য 'শকুনীর ডিম' রচনাটি 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস হতে নেওয়া হয়েছে ।

অপু কাহাকেও একথা বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ঐ বই বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যের একখানা বইএর মধ্যেই এই অদ্ভূত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে!

উঠানের উপর বাঁশঝড়ের ছায়া তখন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক দুপুরে সোনাডাঙার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মত এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাবার অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইয়ের বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বইএর মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কিনা দেখিতে লাগিল। একখানা বইএর মলাট খুলিয়া দেখিল, নাম লেখা আছে 'সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কি, বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলার এই গন্ধটা তাহার বড় ভাল লাগে—গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়। যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এই পুরান বই-এর উপরই তাহার প্রধান মোহ। এইজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড়

অদ্ভুত কথাটা! হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে একথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন,—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস। অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য্য! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ী নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এত দিনে।

বই-খানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠো পাতের ভাত লইয়া বাড়ীর খিড়কি-দোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো—তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, যেন কি অপূর্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের চোখের সামনে খুলিয়া যায়। হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া

পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে—ওই এসেছে। কোত্থেকে এলো দেখলি ?—খুশিতে সে হিহি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারী।—তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে; আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করে; মনে মনে ভাবে—আজ ভুলো আসবে না বোধ হয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে। আজ কি আর শুনতে পেয়েছে!—

হঠাৎ মনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষুর নিমেষে বনজঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির!

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়। বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ চোখ উজ্জ্বল দেখায়! মনে মনে ভাবে—ঠিক শুনতে পায় তো, আসে কোত্থেকে। আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখবো দিকি, তাও শুনতে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই।

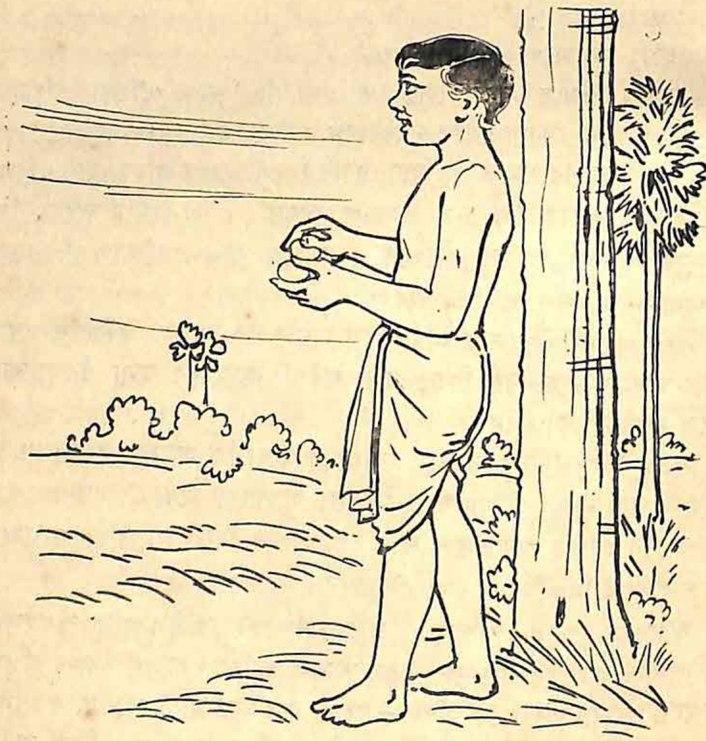
অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা সে ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁটালতলার রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন-চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রং-এর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো ঠাকুর এনেছি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দেখি! পরে আহ্লাদের সহিত উল্টাইতে পাল্টাইতে বলিল—শকুনির ডিম! ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ

উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগ ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব। এই এত বড় বড় সোনা গেঁটে—দেখ্‌বি, দেখাবো?



রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা জোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলো অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি হাতছাড়া

করিত না অন্য সময়, কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুনবীচি খেলা !

ডিম হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মত হাল্‌কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না। সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল—সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো? সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ীর দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিক পাখী, ময়না পাখীর মত ও-ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?

সেই দিনই কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকের হাঁড়ি কলসীর পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে কি যেন ঠক করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের দুটা বড় বড় ডিম এখানে? এঃ, পড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে—দেখেছো কি পাখী ডিম পেড়েছে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না···কান্না··হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনও শুনিনি—শুনেছো সেজঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে—ওই ওদের বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটা, বদমায়েশের ধাড়ি! তাকে বুঝি বলেছে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের ডিম না কিসের ডিম এনে বলেছে এই নাও শকুনির ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেছে তার কাছে! ছেলেটা যে কি বোকা সে আর কি তোমার কাছে কি বলবো ঠাকুরঝি—কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি!

কিন্তু বেচারী সর্বজয়া কি করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই—বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না!

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত!

॥ পাঠসহায়িকা ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূল বক্তব্য ঃ**—[বাবার বইয়ের বাক্সে "সর্বদর্শন সংগ্রহের" পাতায় অপু পড়েছিল—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরে, কয়েকদিন রোদে রেখে, পরে সেই ডিম মুখে রেখে ইচ্ছামত যে কোন স্থানে উড়ে যাওয়া যায়। অপুর মন উড়বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। রাখাল মারফত দুটি ডিম চার পয়সা ও কতগুলি কড়ি দিয়ে সংগ্রহ করল। কিন্তু কোথায় যাবে তাই ভাবতে লাগল। একদিন তার দিদি দুর্গা সলতে পাকাবার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজতে গিয়ে ডিম দুটো আবিষ্কার করল। দেখা গেল ডিম দুটি পচে নষ্ট হয়ে গেছে। শিশু মনের সারল্য এর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে]।

(খ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন :—**

১। কাহিনীটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

২। অপু সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হয়েছে বিশ্লেষণ কর।

(গ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—**

১। "সর্বদর্শন সংগ্রহ" গ্রন্থে কি লেখা ছিল যা অপুকে আকর্ষণ করল ?

২। "সবদর্শন সংগ্রহ" বইটি নিয়ে অপু কি করল ?

৩। শকুনির ডিম কে তাকে সংগ্রহ করে দিল ?

৪। শকুনির ডিমের মূল্য শেষ পর্যন্ত কত দিতে হয়েছিল ?

৫। শেষ পর্যন্ত ডিমের অবস্থা কি হয়েছিল ? অপু কি উড়তে পেরেছিল ?

(ঘ) **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—**

১। "আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুনবীচি খেলা"।

২। "ডিম হাতে করিয়া তাহার মনটা সে ফুঁ দেওয়া রবারের বেলুনের মত হালকা হইয়া ফুলিয়া উঠিল"।

৩। "অপু কাহাকেও একথা বলে নাই—তাহার দিদিকেও না"।

৪। "আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত"।

(ঙ) **শব্দার্থ ঃ**—ছেঁড়াখোঁড়া—ছিন্নবিচ্ছিন্ন ; তেপান্তর—জনশূন্য বিস্তীর্ণ মাঠ ; আঘ্রাণ—নাক দিয়ে গন্ধ গ্রহণ।

(চ) **বাক্যরচনা কর ঃ**—বিন্দু বিসর্গ, ভোজনরত, উত্থাপিত, জীবন বিপন্ন, হুঁশিয়ার, পারিশ্রমিক, মগডাল।

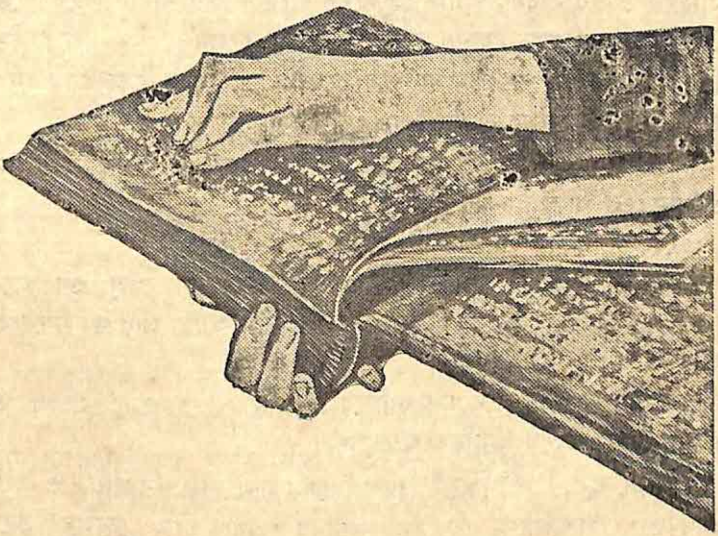
A nice picture of juvenile inquisitive

আলোক তীর্থে

—মুরারীমোহন সেন

লেখক ও বিষয়-পরিচিতি :—[উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক ও সুসাহিত্যিক, আলোচ্য "আলোক তীর্থে" রচনাটিতে লেখক মহীয়সী হেলেন কেলারের এক দুঃসাধ্য অভিযানের তথ্য ও তাঁর জীবন সাফল্যের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন]।

মেয়েটির জন্ম হয়েছিল ১৮৮০ খৃীষ্টাব্দে আমেরিকার অ্যালবামা সহরে। জন্মের পরে মাত্র আঠারোটি মাস আকাশের আলো দেখতে পেয়েছিল সেই মেয়েটি, দেখেছিল বাড়ীর বাগানের রঙীন পাতা আর ফুল !



তারপর ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলো সে ; বাঁচবার কোনো আশাই তার ছিল না—অনেক চিকিৎসায় যখন সে বেঁচে উঠলো তখন দেখা গেল তার দেহের দুটো জানালাই চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। দেখা আর শোনা—দু'টি শক্তি থেকেই বঞ্চিত হোলো।

যখন বড় হয়ে উঠলেন তখন তিনি কতকগুলো ইঙ্গিত আর সংকেতের সাহায্যে ভাষার কাজ চালাতে চেষ্টা করতেন—কিন্তু মনের ভাব তাতে

আর কতটুকু প্রকাশ করা চলে? কণ্ঠে ধ্বনি আছে, কিন্তু ভাষা তো নেই!

জন্মান্ধ এবং জন্ম-বধির এই মেয়েটির জীবনে নেমে এলো গভীর অন্ধকার!

মেয়েটির নাম হেলেন কেলার—এর নাম তোমরা শুনে থাকবে।

সারাজীবন তিনি ছিলেন এক পৃথক জগতে বন্দী, সেখানে আলো নেই, শব্দ নেই—জীবনের কলরব নেই—আছে শুধু চিররাত্রির স্তব্ধতা। তার জীবন অন্ধকার থেকে আলোকের পথে দুস্তর অভিযানের এক বিচিত্র কাহিনী।

এই অভিযানের পথে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তারই শিক্ষিকা অ্যানি সুলিভান! নূতন রীতিতে চললো হেলেনের শিক্ষা!

হাতের স্পর্শের এক অভিনব ভাষা; কাঠের অক্ষরের উপর হাত বুলিয়ে ভাষার সাধনা, অ্যানি হেলেনের হাতে শব্দের বানান লিখে দিতেন। এ এক নূতন খেলা, খেলায় মেতে উঠলেন হেলেন—প্রথম দিকে তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না—যে প্রত্যেক জিনিষেরই একটা নাম দেওয়া যায় এবং সেই নামের বানান লিখে দেওয়া যায় হাতে।

একদিন অ্যানি জলের সংকেত করলেন আর হেলেনের হাত নিয়ে ধরলেন এক পাম্পের নীচে।

হেলেন বুঝতে পারালন ঐ সংকেতের অর্থ জল!

সঙ্গে সঙ্গে একটি অজানা জগতের দ্বার যেন খুলে গেল ওর কাছে। তিনি বুঝতে পারলেন প্রত্যেক জিনিসেরই নাম আছে আর তা নিয়ে কথা বলাও চলে।

দুস্তর সাধনার পথে ওরা এগিয়ে চললেন। হেলেনের সম্বল তাঁর গভীর সংকল্প আর অ্যানির অন্তর্দৃষ্টি।

তিনি শুধু স্পর্শ দিয়েই শিখে নিলেন নানারকম তরুলতা ও ফুলের আকৃতি। পশুশালায় যে সব পশুদের রাখা হত, হেলেন তাদের খাওয়াতেন—হাতের স্পর্শ দিয়েই যেন তিনি দেখতে পেতেন ঘোড়ার দাঁত আর খুর, গরুর দীর্ঘ দাঁত আর শিং।

একদিন এক সার্কাসে গেলেন হেলেন—সেখানে এক সিংহ আর চিতাবাঘের মুখে হাতের মৃদু আঘাত করে তিনি আদর করে এলেন।

হাত যেন তার হারানো চোখ!

কখনও বা ঘোড়ায় চড়ে' তিনি বাইরে ঘুরে আসতেন, মুখে বাতাস

এসে লাগতো —পরিচয় হতো বাতাসের সঙ্গে। কখনও আবার একা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে যেতেন—ফুলের, জলের বা ঘাসের গন্ধ তাকে পথ চিনিয়ে দিত।

কত গন্ধের কত বিচিত্র অনুভূতি!

তাই দিয়েই হেলেন বুঝে নিতেন তিনি কোথায় আছেন—খোলা মাঠে না গাছের নীচে। অ্যানির স্বপ্ন ছিল, যাদের চোখ আছে, যারা শুনতে পায় তাদের মতই জীবন যাপন করবেন হেলেন।

সাহস থাকলে কোন কিছুই অপূর্ণ থাকে না।

এই কথাই প্রমাণ করলেন হেলেন নিজের সাধনা দিয়ে।

ক্রমে সাহিত্য ও বিজ্ঞানে তার দীক্ষা হোলো—জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করলেন।

হেলেন দেখলেন—অন্যের ঠোঁটের উপর নিজের হাতের আঙ্গুল মৃদুভাবে রেখে তীন বুঝতে পারছেন সে কি বলতে চায়!

ধীরে ধীরে সব পরীক্ষাই হেলেন পাস করলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তিনি প্রমাণ করলেন ভগবান যাদের ইন্দ্রিয়শক্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন তাদের নিরাশ হবার কারণ নেই।

এই সব বঞ্চিত মানুষদের জন্যই হেলেন তাঁর জীবন উৎসর্গ করে-ছিলেন। তেইশ বৎসর বয়সে তিনি লিখলেন—'আমার জীবন কথা'। এরপর দেশে দেশে তিনি ঘুরে বেড়ালেন একটি পথের সন্ধানে যে পথে এই সব দুর্গতদের সুখী করা চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হেলেন অনেক দেশে ঘুরেছিলেন; যাহারা আহত হয়েছে—কিংবা দুর্ঘটনায় অন্ধ বা বধির হয়েছে তাদের উৎসাহ দিয়ে নূতন জীবনে দীক্ষিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

বাধার মুখে অন্তহীন দুঃখে অন্তরের প্রশান্তিই ছিল তাঁর প্রধান সম্পদ —এই আনন্দের দীপ্তিই তিনি যেখানে গেছেন সকলের মুখেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর জীবনের শিক্ষা—সুখ আসে অন্তর থেকে, আর সিদ্ধি আসে সংকল্প থেকে।

॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূল বক্তব্য**—[১৮৮০ খৃীঃ আমেরিকার "অ্যালাবামা" শহরে হেলেন কেলার জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের কিছুকালের মধ্যে দেখা গেল তিনি দেখা এবং শোনা—দুটি শক্তি হতেই বঞ্চিত। বড় হয়ে নিরাশ না হয়ে তিনি সাধনায় ব্রতী হলেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁরই শিক্ষিকা অ্যানি সুলিভান। তিনি এক

নতুন রীতিতে তাঁকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন, এই ভাবে ধীরে ধীরে এক অজানা জগতের দ্বার খুলে গেল তার কাছে। স্পর্শের সাহায্যে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে। তিনি তাঁর নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরই মত বঞ্চিত মানুষদের জন্য]।

(খ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। হেলেন কেলার কে? তাঁকে নতুন অভিযানের নায়ক রূপে অভিনন্দিত করা হয় কেন?

২। কেলার কি ভাবে এবং কার সাহায্যে সাধারণ মানুষের মত অনুভূতিশীল হয়ে উঠলেন তা বিশ্লেষণ কর।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—

১। হেলেন কেলার কোথায়, কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

২। হেলেন কেলার কি ভাবে অন্ধ ও বধির হলেন?

৩। কাহিনীর নামকরণ আলোচনা কর।

(ঘ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

১। "হাত যেন তাঁর হারানো চোখ"।

২। "এ এক নূতন খেলা, খেলায় মেতে উঠলেন হেলেন।"

৩। "সাহস থাকলে কোন কিছু অপূর্ণ থাকে না।"

(ঙ) শব্দার্থ :—চিররাত্রি—অন্তহীন অন্ধকার; অন্তর্দৃষ্টি—আত্মজ্ঞান; দুর্গত—দুর্দশাগ্রস্ত।

(চ) শূন্যস্থান পূরণ কর :—বাধার—অন্তহীন দুঃখে—প্রশান্তিই—তাঁর—সম্পদ। তার জীবনের—সুখ আসে—থেকে।

Life of a great woman.

তোমাদের সুভাষ

—অসিত মুখোপাধ্যায়

লেখক ও বিষয়-পরিচিতি ঃ—[জন্ম ১৯৪৪ খৃঃ, কলকাতার একটি কলেজের বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক। "কিশোর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা", "স্বদেশ ও স্বদেশী", "প্রবেশিকা ব্যাকরণ ও রচনা," "বাংলা দ্বিতীয় পত্র", "নায়ক বনাম ঔপন্যাসিক" প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাল্যজীবনের একটি কাহিনী এই অংশে ব্যক্ত হয়েছে।]

বালক সুভাষের ফুলের মত নির্মল ও সুন্দর মুখ, কিন্তু অন্তরে ছিল বজ্রের দৃঢ়তা।

প্রথম হইতেই সেবাব্রতের মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত—তিনি যখন স্কুলের ছাত্র—তাঁহার যত্নেই একটি কর্মী সেবাদল গড়িয়া উঠিয়াছিল। যেখানে দুঃখ বা ব্যাধির আক্রমণ, সেইখানেই ঝাঁপাইয়া পড়িত এই ক্ষুদ্র সেনাদল—আর সেই সঙ্গে দলের নেতা স্বয়ং সুভাষ। কোথায় আগুন লাগিয়াছে—দেবদূতের মত ছুটিয়া আসিত বালক সুভাষের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

সুভাষ তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

কটকে ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে বিসূচিকা রোগ—সারা সহরে ভীষণ এক আতঙ্কের ছায়া !

এই সময়ে আশা ও আশ্বাসের বাণী নিয়া আসিলেন সুভাষ ও তাঁহার সেবকদল। অদ্ভূত দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সংগে তিনি অসহায় রোগীদের শুশ্রূষায় মাতিয়া উঠিলেন।

তাঁহার পিতা জানকীনাথ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান—তিনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া শহরের অলি-গলি পরিদর্শন করিতে ব্যস্ত, তখন সুভাষও নগ্নপদে এক হাতে ঔষধ আর অন্য হাতে পথ্য বহন করিয়া দুর্গতদের দ্বারে দ্বারে চলিয়াছেন মুক্তির দূতরূপে।

বালক বয়সেই সুভাষ বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত ; জাতি বিচার নাই, ছোট-বড় নাই—তাঁহার কাছে আর্ত মানুষ যেন নর-নারায়ণ। কিন্তু এই পবিত্র সেবার কাজেও সুভাষকে বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল হায়দার।

হায়দার এক স্বভাব দুর্বৃত্ত দলের নেতা। তিন তিন বার জেল খাটিয়াও তাহার উগ্র স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তাহার ক্রোধের কারণ, যতবারই সে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে—ততবারই তাহার মুক্তির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে বাবুপাড়ার সরকারী উকিল সাহেব।

তাই বাবুপাড়ার ছেলেদের সে সহ্য করিতে পারে না। বস্তির এত বড় দুর্দিনেও সে প্রচার করিতে লাগল—বাবুপাড়ার বাঙালী



বাবুরাই কারসাজী করিয়া মড়ক পাঠাইয়াছেন—উহাদের সাহায্য নেওয়া চলিবে না।

কিন্তু সুভাষ বিচলিত হইলেন না—ভয় পরাজিত হইল সংকল্পের কাছে। হায়দার যখন সেবাদলকে পাড়া হইতে বিতাড়িত করিবার কাজে ব্যস্ত—সেই সময়ে একদিন তাহার গৃহে দেখা দিল মড়কের করাল ছায়া। তাহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রোগে আক্রান্ত—দুর্ভাবনায় অধীর হইয়া হায়দার ছুটিল ডাক্তারের কাছে।

কিন্তু কোথায় ডাক্তার! চারিদিকে রোগের আক্রমণ—সর্বত্র রোগীর ডাক। ডাক্তার দুর্লভ! হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া হায়দার যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে সে বিস্মিত হইয়া গেল।

বাবুপাড়ার সেই ছেলেরাই তাহার দাওয়া জুড়িয়া বসিয়া আছে। সে

অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল সেবাব্রতীদের স্নিগ্ধ হস্তের অপূর্ব কাজ! বাড়ীর আবর্জনা পরিষ্কার করা হইয়াছে। দাওয়ার উপরে মাদুর পাতা—মাদুরের উপরে বিছানো শাদা চাদর, সেখানে ঔষধ সাজানো, একপাশে ঢাকনা দেওয়া রোগীর পথ্য। এই সব ঐ বাবুপাড়ার ছেলেরাই বহন করিয়া আনিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে হায়দারের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। একটু সামনে আসিয়া সে বলিল—আমি তোমাদের দুষমন, তা জেনেও তোমরা এলে?

সুভাষের মুখে মৃদু হাসি। তিনি বললেন—তোমার ছেলে যে আমাদের ভাই, আমরা এসেছি তাকে সারিয়ে তুলতে। ভাইটির বাপ কি কখনো দুষমন হতে পারে?

হায়দরের স্ত্রী-পুত্র ক্রমে ক্রমে ভালো হইয়া উঠিল; কোন্ মন্ত্রে, কে বলিবে, হায়দারও ভালো হইয়া গেল। তাহার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিল—যেন এক নূতন মানুষ!

সুভাষ যে সেবাব্রতীর দল গঠন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের মঙ্গল-চিন্তাই তাঁহার আদর্শ ছিল—'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই পবিত্র মন্ত্রেই তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি দলের জন্য এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শৈশবেই মায়ের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পড়িয়া তিনি যেন এক নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি পড়িলেন কর্মযোগী মহামানব বিবেকানন্দের জীবন-কথা আর তাঁহারই রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলি!

তিনি সেই বয়সেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর!' শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ছবির সামনে তিনি ভাবিতেন—শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি দেখি নাই, কিন্তু তিনি যে প্রেরণার মন্ত্রে নরেন্দ্রকে বিবেকানন্দে পরিণত করিয়াছিলেন, আমি যদি সেই প্রেরণা পাইতাম—তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল সাধনায় আমি ধন্য হইতে পারিতাম!

ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে—বালক সুভাষের এই সংকল্প—এই সাধনা পরবর্তী জীবনে সার্থক হইয়াছিল।

Subhaschandra's Childhood days and his determination.

॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূল বক্তব্য ঃ—[** সুভাষচন্দ্র যখন স্কুলের ছাত্র তখন হতেই তিনি সেবা মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁর দ্বারাই গঠিত হয়েছিল একটি সেবাদল, যারা দুর্গতের সেবা করত। তাদের সেবার মধ্যে কোন জাত-পাতের বিচার ছিল না। ছোট বড় যে কোন মানুষই তাদের কাছে নরনারায়ণ। হায়দার বলে এক দুর্বৃত্তদলের নেতা ছিল। সে এই সেবাদলের কাজকর্ম পছন্দ করত না। তার অবশ্য কারণও ছিল. যতবারই সে ধরা পড়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে—ততবারই তার মুক্তির চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন বাবুপাড়ার সরকারী উকিল সাহেব। একদিন হলো কি তার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র কলেরা রোগে আক্রান্ত হল। হায়দার অনেক চেষ্টা করে ডাক্তার জোগাড় করতে পারল না। বিকল মনোরথে সে যখন বাড়ি ফিরল. দেখল—যাদের সে ঘৃণা করে সেই সেবাদলের লোকেরা তার স্ত্রীপুত্রের সেবা করছে। এদৃশ্য দেখে হায়দারের মন গলে গেল। তাঁর স্ত্রী-পুত্র তো সুস্থ হলো, হায়দারও অন্য মানুষে পরিণত হলো।]

(খ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ—**

১। সুভাষচন্দ্রের বাল্যজীবনের যে কাহিনী বলা হয়েছে তা ব্যক্ত কর।

২। হায়দার কে? তার চরিত্রের পরিবর্তন কি ভাবে হলো?

৩। এই কাহিনীতে সুভাষ চরিত্রের যে দিকটা ফুটে উঠেছে আলোচনা কর।

(গ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—**

১। সেবাদলের নেতা কে ছিল? এই দলের কাজ কি ছিল?

২। সুভাষচন্দ্র কার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

৩। সেবাদলের প্রতি কে বিরূপ ছিল এবং কেন?

৪। সেবাদলের বিরুদ্ধে হায়দার কি প্রচার করত?

৫। হায়দার-এর পরিবর্তন কি ভাবে হলো?

৬। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সুভাষ চন্দ্র কি ভাবতেন?

(ঘ) **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—**

১। "ভয় পরাজিত হইল সংকল্পের কাছে"।

২। "তাহার প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিল— যেন এক নূতন মানুষ"।

৩। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।

(ঙ) **শব্দার্থ ঃ** নিষ্ঠা—শ্রদ্ধা, অনুরাগ, বিসূচিকা—কলেরা, রূপান্তর—পরিবর্তন।

(চ) **বাক্য রচনা কর ঃ—**দুষমন, রূপান্তর, আদর্শ, দীক্ষিত, প্রেরণা।

ইন্দ্রনাথ

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক ও বিষয়-পরিচিতিঃ—[জন্ম ১৮৭৬ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯৩৮ খ্রীঃ। বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তুচ্ছ অবহেলিত মানুষের প্রতি তার অপরিসীম মমতা ছিল। তাই তিনি বাঙালী পাঠকের কাছে "দরদী" কথা-শিল্পী রূপে পরিচিত। এই অংশ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "শ্রীকান্ত" এর প্রথম পর্ব হতে সংকলিত]।

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানি তর্‌ তর্‌ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণদিকের আগ্রীবমগ্ন বনঝাউ এবং কসাড়বন মাথা তুলিয়া এই দুই অসম সাহসী মানবশিশুর পানে বিস্ময়স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বামদিকেও তাহাদের আত্মীয়-পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয় তাহাদের সংকেত অমান্য করিতাম না ; কিন্তু কর্ণধার যিনি, তাঁহার কাছে বোধ করি 'রামনামে'র জোরেই ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই মাঠটি চোখে পড়িল। সেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপর যে গাছপালা নাই, দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। মাঠের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এই জন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্লেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া উঠিয়াই একটা ভয়জড়িত স্বরে 'ইস্‌' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম সুতরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে ইন্দ্র নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকাল-মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই! ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না। গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। শুধু মাঝে মাঝে ঝোপঝাপের অন্তরালে শ্মশানচারী

শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ-চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ, আর বহু দূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি



গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি মাঠের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নধর দেহটি এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে-স্থলে বিন্যস্ত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমার চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি।

চোখের জল দেখিবামাত্র আমারও চোখে জল আসিতেছিল সত্য, কিন্তু ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সংকুচিত হইয়া পড়িলাম। পর দুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না ; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া

আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া—সে ঢের ঢের কঠিন কাজ! তখন ছোট বড় কত যায়গাতেই না টান ধরে। একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের বংশধর হইয়া জন্মিয়া জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বাঁধা-বাঁধি, কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘটা। তাহাতে এ কোন রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে?

ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্য হাত হাঁটুর নীচে দিয়া, একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়া-ছেঁড়ি করে খাবে। আহা! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েছে রে! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকেরে?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জ্যত আছে? আমগাছ, জাম গাছ যে কাঠের তৈরী হোক্—এখন ডিঙি ছাড়া কেউ বলবে না—আমগাছ, জামগাছ—বুঝলি না? এও তেমনি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানুষের মত, এখন তাহা মানি; কিন্তু অন্তরের মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ম সত্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে।

॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥

(ক) মূল বক্তব্য :—[ডিঙ্গীতে দু জন যাত্রী, শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ। যে পরিবেশের মধ্যে এরা যাত্রা করেছে তাতে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, অন্ধকার রাত্রিতে বাতাসের বেগে গাছের পাতাগুলো নড়ছে, ভয় চোখে শ্রীকান্ত তা দেখল, মনে হল গাছগুলি যেন মাথা নেড়ে নিষেধ করছে। শ্রীকান্ত একা হলে ফিরে যেত, কিন্তু ইন্দ্রনাথ ডিঙ্গি বেয়ে চলতে লাগল। একটি মাঠের কাছাকাছি এসে, ডিঙ্গি লাগাতে না লাগাতে ইন্দ্র—'ইস' করে উঠল। দুজনেই চেয়ে দেখল ছয় সাত

বছরের হৃষ্টপুষ্ট বালকের মৃতদেহ জলে ভাসছে। শিয়ালে খাবে বলে মৃতদেহ-টাকে নৌকায় তুলে যাত্রা করল ।

(খ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ—

১। ইন্দ্রনাথ চরিত্র বিশ্লেষণ কর ?

২। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের নৈশ অভিযানের বর্ণনা দাও।

৩। শ্রীকান্ত চরিত্র বিশ্লেষণ কর ?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—

১। "মড়ার আবার জাত কি !" কে, কখন কাকে বলেছিল ? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও ?

২। "কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ম সত্য ইহার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে !"—উক্তিটি কার ? কেন এই উক্তি ? এখানে কোন্ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?

(ঘ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১। "বোধ করি রামনামের জোরেই ইহাদের সমস্ত আবেদন নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল"।

২। "অকাল মৃত্যু বোধকরি……না দেখিলে বোধকরি দেখাই হয় না"।

৩। "কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে… কত জায়গাতেই না টান ধরে"।

(ঙ) শব্দার্থ ঃ—আগ্রীবমগ্ন—গলাপর্যন্ত ডোবানো ; পক্ষতাড়নশব্দ—পাখী ডানা নাড়িবার শব্দ ; হৃদয়ভেদী—যা মনকে দ্রবীভূত করে ; দৃষ্টান্ত—উদাহরণ, উপমা।

(চ) বাক্য রচনা কর ঃ—অনুকূল, সমাচ্ছন্ন, পশ্চাতে, দৃষ্টিপাত, অকালমৃত্যু, স্তব্ধতায়, হৃষ্টপুষ্ট, ছেঁড়াছেঁড়ি।

(ছ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

ইন্দ্র—আসিয়া—তাহার—তলায়— —হাত—নীচে—, —শুষ্ক—মত—তুলিয়া—কহিল, —বেচারাকে—ছেঁড়া ছেড়ি—খাবে।

(জ) বিপরীত শব্দ লেখ ঃ—কুণ্ঠিত, সন্তর্পণে, সুকুমার, নিবিড়, পরিপূর্ণ।

(ঝ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ—নিস্তব্ধ, সমাচ্ছন্ন, হৃদয়ভেদী।

Story of the brave and kindhearted boy

বীরাঙ্গনা মাদাম কামা

—হরিপদ ঘোষ

লেখক ও বিষয়-পরিচিতি :—[হরিপদ ঘোষ তরুণ লেখকদের অন্যতম। বিচিত্র অভিযান ও আবিষ্কারের কাহিনী রচনা করে ইতিমধ্যে কিশোর সাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই রচনাংশে তিনি এক বিপ্লবী নেত্রীর জীবন কথা ব্যক্ত করেছেন, যিনি বিদেশের মাটিতে থেকেও ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন]।

তখন এদেশের শাসনক্ষমতা বিদেশী ইংরেজের হাতে। পরাধীন ভারতবাসী তাদের পদানত দাস মাত্র।

পরাধীনতার- লাঞ্ছনা আর অপমান মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগায়। ভারতবাসীর মনেও ততদিনে জেগে উঠেছে নিজের দেশে নিজের অধিকারের চিন্তা।

কিন্তু হলে হবে কি। সব ক্ষমতা বিদেশীর হাতে। অধিকার কেউ কি সহজে ছাড়তে চায়? অনেক কষ্টে ওরা এই ভারত শাসনের অধিকার লাভ করেছে। এসেছিল একদিন এদেশে ব্যবসা করতে—দাঁড়ি-পাল্লা হাতে নিয়ে; তারপর রাতারাতি একেবারে রাজসিংহাসন দখল করে বসল। সে অধিকার তারা কেন সহজে ছাড়তে চাইবে?

কিন্তু ভারতবাসীও ততদিনে ভাবতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে —নিজের দেশে নিজের অধিকার হারিয়ে পরাধীন থাকা পাপ। ওটা মাতৃভূমির বন্দীদশা। ওই বন্দীদশা থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পারলে নেই দেশবাসীর মুক্তি, নেই দেশের উন্নতি।

দেখতে দেখতে একদল স্বাধীনতাকামী মানুষ ইংরেজ বিতাড়নের কলাকৌশল পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠল গোপনে।

এই সময়ে আর একদল লোকও ছিল যারা রাজভাষা ইংরেজী শিখে নিজেদের ইংরেজ সাহেব ভেবে আনন্দ পেতো। ইংরেজদের খুশী করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ। আসলে এরাই ছিল দেশের প্রধান শত্রু।

এমনি একটি ইংরেজভক্ত পরিবারেই বিয়ে হয়েছিল মহারাষ্ট্রের মেয়ে রুস্তম ভিকাজী'র। বিয়ে হল বটে কিন্তু স্বামীর ঘর তিনি করতে

পারলেন না। ইংরেজভক্ত স্বামী মিঃ কে আর কামা'র চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তিনি নিজের চিন্তা মেলাতে পারলেন না। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বুকে ছিল পরাধীনতার জ্বালা, মনে ছিল গ্লানি। তাঁর চিন্তা জুড়ে ছিল মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির ভাবনা।

স্বামীর ঘর তাই করতে পারলেন না রুস্তমজী ভিকাজী—বিয়ের পর যাঁর নাম হয়েছিল মাদাম কামা।

পথে নেমে এসে মেয়েটি ভারতকে পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত করার ব্রতকেই জীবনের আদর্শ করে নিলেন। পরাধীন দেশবাসীর দুঃসহ অবস্থা দেখে তিনি নিরন্তর মর্মযাতনা ভোগ করতেন। নিরুপায় আক্রোশে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন ; কিন্তু কাজে অগ্রসর হবার পথ কোথায় ?

কিন্তু পথের যে সন্ধানী, তার কাছে পথের হদিস কখনও গোপন থাকতে পারে না। মাদাম কামাও পথ খুঁজে পেয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ইংরেজ সাধারণ আঘাতে বিচলিত হবার জাতি নয়। তার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে গেলে চাই শক্তি সঞ্চয়, শক্ত আঘাত ; আর সুপরিকল্পিত প্রস্তুতির মাধ্যমেই তেমন আঘাত সম্ভব।

মাদাম কামা সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন মনে মনে।

ততদিনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের তৎপরতা রীতিমত শুরু হয়ে গেছে। এদিক সেদিকে ঘটছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা। মারা পড়ছে দু-একজন ইংরেজ। কিন্তু বিপ্লবীদলের সব চাইতে বড় অসুবিধা ছিল অস্ত্রশস্ত্রের। তার অভাবে তাদের কাজ পরিকল্পনা মত দ্রুত এগুতে পারছিল না। মাদাম কামা দলের বাইরে থেকেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন এই অসুবিধা। তিনি বুঝতে পারলেন, ইংরেজদের রাজ্যে ইংরেজকে আঘাত করতে হলে অস্ত্র আনাতে হবে বাইরে থেকে। আর এই সুযোগ নিতে হবে ইংরেজের শত্রু-দেশগুলোর কাছ থেকে।

মাদাম কামার চিন্তা-ভাবনা যখন বৃহৎ একটা সংগঠনের পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই সময় হঠাৎ তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। সুযোগ বুঝে দেশমাতৃকার একান্ত সেবিকা শরীর সুস্থ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন।

বিদেশে এসেই তার কর্মতৎপরতা বেড়ে গেলো। বিরাট কর্মক্ষেত্র

খুঁজে পেলেন তিনি। ভারতে ইংরেজের অপমানের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ব্রতী হলেন তিনি প্রথমে। সেই সঙ্গে গোপনে চলল ভারতপ্রেমিক-সংগঠন ও জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ। যাতে ইংরেজের শত্রুদেশের যোগাযোগের সুযোগ সহজ হয়।

বিদেশ থেকে দেশের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের যাতে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা সম্ভব হয় প্রধানতঃ সে বিষয়েই চলল মাদাম কামার আন্তরিক প্রয়াস, এই সময়ে ভারত থেকে পলাতক অনেক বিপ্লবী ও দেশকর্মীর সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে, এদের সকলের কাছেই মাদাম কামা ছিলেন প্রেরণার উৎস।

বাংলার বিপ্লবী দলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন ঋষি অরবিন্দ, তাঁর ভাই বারীন ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাদের চেষ্টা চলছিল তখন বোমা তৈরীর। কিন্তু কে শেখাবে তাদের বোমা তৈরীর কলাকৌশল? তখন হেমচন্দ্র কানুনগোকে ইংলণ্ডে পাঠান হোল বোমা তৈরীর কৌশল শেখার



জন্য। মাদাম কামা বিলেতে তার জন্য একটি লেবরেটরী তৈরী করে দিলেন তো বটেই, বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীতে দক্ষ একজন বিদেশীকেও নিযুক্ত করে দিলেন।

বিদেশে তখন মাদাম কামার প্রচারের কাজও চলেছে জোর—তাঁর

নিজস্ব কয়েকটি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি সমিতিও এই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়ে উঠেছে তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

এই সময়ে জার্মানীর স্টুগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সময়টা ১৯০৭ সালের ১৮ই আগষ্ট। ভারতের প্রতিনিধি রূপে সম্মেলনে যোগ দেন মাদাম কামা। ভারত বিদেশীর অধীনতা-মুক্ত আর স্বাধীন ভারতের মুক্ত আকাশে উড্ডীন হবে জাতির স্বাধীনতার প্রতীক—একটি জাতীয় পতাকা ; মাদাম কামা মনের নিভৃতে এই স্বপ্ন পালন করে আসছেন আবাল্য। এবারে তারই সার্থক রূপায়ণ দেখা গেল সভাপ্রাঙ্গণে তাঁর হাতে। অন্যান্য দেশের পতাকার পাশাপাশি উড্ডীন হল ভারতের একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। অভিবাদন জানানো হল এই জাতীয় পতাকাকে।

সেই প্রথম উদ্ভাবিত হল ভারতের জাতীয় পতাকার রূপ। বর্তমানের অশোকচক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা তাঁর পরিকল্পনার ভিত্তিতেই রূপায়িত।

মাদাম কামার বিপ্লববাদ প্রচার এসময়ে কেবল ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমেরিকা গিয়েও তিনি বিপ্লববাদ প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁর কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার এতকাল ধৈর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। ১৯০৯ সালে সরকার তাঁকে ইংরেজের রাজত্ব থেকে বহিষ্কারের আদেশ ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে মাদাম কামাকে লণ্ডনের বাস উঠিয়ে ফরাসী রাজ্যের প্যারিসে চলে আসতে হল।

ভারতে এবং ভারতের বাইরে ততদিনে বিপ্লবীদের কাজ জোরদার হয়ে উঠেছে। ভারতের বিপ্লবীরা মাদাম কামার কাছ থেকে গোপনে পেতে লাগলেন অস্ত্র-শস্ত্রের জোগান, বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা। মহারাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বীর সাভারকার এই সময় লণ্ডনে বাস করেছিলেন। পুলিস একটি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁকে খুঁজে ফিরছিল। মাদাম কামা তখন তাঁকে প্যারিসে নিজের কাছে এনে রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একদিন লণ্ডন পুলিশের হাতে তাঁকে বন্দী হতে হয়।

এর পরের ঘটনা বড়ই চমকপ্রদ।

বিচারের উদ্দেশ্যে ধৃত সাভারকারকে ভারতে চালান করা হল জাহাজে। সাভারকার গোপনে খবর পাঠালেন মাদাম কামাকে যেন পথের কোথাও তিনি এমন ব্যবস্থা রাখেন যাতে জাহাজ থেকে পালিয়ে তিনি ইংরেজের নাগালের বাইরে গিয়ে পৌঁছাতে পারেন।

বন্দী সাভারকারকে নিয়ে ব্রিটিশ জাহাজ লণ্ডন ত্যাগ করে ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের কাছে এলে রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে বীর সাভারকার জাহাজের পোর্টহোল থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু সাঁতরে ফরাসী উপকূলে ওঠার পর তিনি ফরাসী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তারা তাঁকে ইংরেজ বাহিনীর হাতে পুনরায় অর্পণ করে।

মাদাম কামা পূর্বের সংবাদ অনুযায়ী সাভারকারকে রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বন্দরে পেঁছাতে তাঁর একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন সশস্ত্র সঙ্গীদের নিয়ে পেঁছান, তখন দেখতে পান বন্দী সাভারকারকে নিয়ে তাঁর রক্ষীবাহিনী জাহাজে উঠছে।

মাদাম কামা দমবার পাত্রী ছিলেন না। বিদেশের মাটিতে রক্ষা করতে না পারলেও স্বদেশে ইংরেজের জেল থেকে সাভারকারকে ছাড়িয়ে আনার সবরকম চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। সাভারকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ভারতের নাসিকের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে যে পিস্তলটি দিয়ে হত্যা করা হয়, সেই ব্রাউনিং পিস্তলটি, সাভারকার ইংলণ্ড থেকে পাঠিয়েছিলেন। সেই অভিযোগ খণ্ডনের জন্যও মাদাম কামা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। প্যারিসের বৃটিশ কনসাল জেনারেলকে তিনি জানিয়েছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার পর নাসিকে বিপ্লবীরা যে পিস্তলটি ফেলে যায় সেটি সাভারকার পাঠাননি, পাঠিয়েছিলেন তিনি নিজে।

কিন্তু আদালত এ সত্ত্বেও সাভারকারের বিচার করেছিল এবং তাঁর দীর্ঘকাল দ্বীপান্তরবাসের দণ্ড হয়েছিল।

এরপর থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই বীরাঙ্গনা যেন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর দুঃসাহস যেন আরও বেড়ে গেল।

১৯১৪ সাল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল। যুদ্ধের সময় ফরাসী বন্দরে ইংরেজ পক্ষের বহু ভারতীয় সৈন্য ছাউনি ফেলে অস্থায়ী ভাবে বাস করেছিল। মাদাম কামা গোপনে সৈন্যদের ছাউনিতে গিয়ে ভারতীয় সেনাদের, ভারতের শত্রু, ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরামর্শ দিতে থাকেন। এই প্রচারের ফল ফলতেও বিলম্ব হল না। সৈন্যদের মধ্যে আলোড়ন ও উত্তেজনা দেখা দিল।

মাদাম কামার এই গোপন প্রচার কার্যের খবর ইংরেজ সরকারের কানে পেঁছাতে সময় লাগল না। ফরাসী সরকারকে তারা অনুরোধ করলেন মাদাম কামাকে বন্দী করে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করতে।

ফরাসী সরকার বন্দী করে মাদাম কামাকে ভারতে পাঠালেন না বটে, তবে নিজেদের ভিটি নামক দুর্গে তাঁকে আটক করে রাখলেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী ভারতীয় নারীর এই প্রথম কারাবাস। পরবর্তীকালে বহু স্বাধীনতা-সংগ্রামী নারী বন্দী হয়েছেন কিন্তু তাঁদের সকলেরই অনুপ্রেরণা ছিল মাদাম কামার ত্যাগ ও দেশ-ভক্তির আদর্শ।

কারাগারে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে ফরাসী সরকার মাদাম কামাকে মুক্তি দেন। কিন্তু বাইরে এসেই এই বীরাঙ্গনা আবার কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জীবনের সকল সুখদুঃখ, চাওয়া-পাওয়া যে নারী দেশ মাতৃকার চরণে নিবেদন করেছেন তাঁর পক্ষে এই-ই তো সম্ভব। দেশের মুক্তিই যে তাঁর আনন্দ সুখ শান্তি—সব কিছু। সংগ্রামই যে তাঁর জীবন!

কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেই মাদামা কামা ইংরেজ শত্রু রাশিয়ার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তিনি রাশিয়াকে জানালেন —ভারতের জনসাধারণ বিপ্লবের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পেলেই তারা ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করতে পারেন। এই বিপ্লবী নেত্রীর আবেদনে রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা লেনিন মাদাম কামাকে রাশিয়া যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ততদিনে বিলম্ব হয়ে গেছে। মাদাম কামার শরীর তখন ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে। রাশিয়া আর তাঁর যাওয়া হল না।

অনেক কষ্টে সরকারী অনুমতি সংগ্রহ করে প্রায় ত্রিশ বৎসর পর ৮৫ বৎসর বয়সে ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে ভারতকন্যা মাদামকামা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর পর বেশীদিন তিনি বাঁচেন নি। জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বিদেশের মাটিতে থেকে যে অক্লান্ত সংগ্রাম তিনি সুদীর্ঘকাল করে গেছেন তার সার্থক পরিণতি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম, অতুল আত্মত্যাগ আজও ঘোষণা করছে—তাঁরই উদ্ভাবিত আমাদের জাতীয় পতাকা।

॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥

(ক) মূল বক্তব্য ঃ—মহারাষ্ট্রের মেয়ে রুস্তম ভিকাজীর (মাদাম কামা) এক ইংরেজ ভক্ত পরিবারে বিয়ে হয়েছিল। ইংরেজ ভক্ত স্বামী মিঃ কে. আর. কামার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারা বিরোধ ঘটায় স্বামীর ঘর তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হল না।

ভারতে ইংরেজের লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে তিনি জনমত গঠনে ব্রতী হলেন। ১৯০৭ সালে ১৮ই আগষ্ট জার্মানীর ষ্টুগার্ট সহরে যে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন হয়েছিল সেখানে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বিপ্লববাদের কথা শুধু ইংলণ্ডে নয় আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রচার চালিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে বিভিন্ন সময়ে কারাবরণ করতে হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে ৭৫ বছর বয়সে তিনি স্বদেশে ফিরলেন, তখন কিন্তু ভারত স্বাধীন হয় নি। না হোক, তাঁর জলন্ত দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয়।

(খ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ—**

১। মাদাম কামাকে বীরাঙ্গনা বলা হয় কেন? সংক্ষেপে তাঁর আদর্শ ও কর্মধারা বিশ্লেষণ কর।

২। দেশের মুক্তির জন্য মাদাম কামা কোন্ আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

(গ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ—**

১। "সেই প্রথম উদ্ভাবিত হল ভারতের জাতীয় পতাকার রূপ"। সেই প্রথম বলতে কবে, কোথায়? ঘটনাটি বিশ্লেষণ কর।

২। "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী ভারতের নারীর এই প্রথম কারাবাস"।

—কার প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে? কিসের জন্য তিনি কারাবরণ রেছিলেন?

৩। এঁদের সম্পর্কে যা জান লেখ ঃ—অরবিন্দ ঘোর, বারীন ঘোষ, ানিন।

(গ) **শব্দার্থ** ঃ—হদিস—সন্ধান; তৎপরতা—উদ্যোগ; ছাউনী - সেনা-নিবাস; বীরাঙ্গনা—বীরনারী, সেবিকা—একাগ্রকর্মী।

(ঘ) **বাক্য রচনা কর** ঃ—জনমত, বিপ্লবীদল, সংগঠন, বিশেষজ্ঞ, সম্মেলন, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, চিরস্মরণীয়।

Activities of a great revolutionary

জয়-পরাজয়

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

লেখক ও বিষয় পরিচিতি ঃ—[জন্ম-১৮৬৩ খৃীঃ, মৃত্যু ১৯১৩ খৃীঃ। নিবাস কৃষ্ণনগর, নদীয়া। তিনি কবিতা ও নাটক উভয় ক্ষেত্রেই খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গান, বিশেষ করে হাসির গান বাংলা সহিত্যের সম্পদ। তাঁর নাটকগুলি হলো—সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, মেবার পতন ইত্যাদি, তিনি ডি, এল, রায় নামে খ্যাত। আলোচ্য পাঠ্যাংশটি "সাজাহান" নাটকের একটি দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত]।

স্থান—ঔরংজীবের বহির্ঃকক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। যা করেছি—ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোত—(বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ কি অন্ধকার!—কে দায়ী? আমি! এ বিচার! ও কি শব্দ?—না বাতাসের শব্দ! এ কি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর কর্ত্তে পার্ছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না, (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! (পরিক্রমণ ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া) ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির? সুজার রক্তাক্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ! যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তারা আবার আমায় ঘিরে নাচ্‌ছে!—কে তোমরা? জ্যোতির্ম্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও।—চলে যাও! ঐ মোরাদের কবন্ধ আমায় ডাকছে; দারার মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাস্‌ছে—এ কি সব! —ওঃ! (চক্ষু ঢাকিলেন ; পরে চাহিয়া) যাক্! চলে গিয়েচে!—উঃ— দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে! মাথার উপর যেন পর্বতের ভার।

দিলদারের প্রবেশ

ঔরংজীব। (চমকিয়া) দিলদার?

দিলদার। জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। এ সব কি দেখলাম—জানো?

দিলদার। বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি—তবে আরম্ভ হয়েছে?

ঔরংজীব। কি ?

দিলদার। অনুতাপ! জান্তাম, হতেই হবে! এত বড় অস্বাভাবিক আচরণ—নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম—প্রকৃতির কি বেশী দিন সয় ? সয় না।

ঔরংজীব। নিয়মের কি ব্যতিক্রম, দিলদার ?

দিলদার। এই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে রাখা! জানেন জাঁহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্মমতায় আজ উন্মাদ!—তার উপর উপর্যুপরি এই ভ্রাতৃহত্যা! এত বড় পাপ কি অমনি যাবে ?

ঔরংজীব। কে বলে আমি ভ্রাতৃহত্যা করেছি? এ কাজীর বিচার!

দিলদার। চিরকালটা পরকে ছলনা করে' কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্ত্তে পারেন ? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত! ভাইকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মার্‌তে পারেন না! হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন, গভীর আচ্ছাদিত ভগ্নধ্বনি—হৃদয়ের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠ্‌বে—এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ঔরংজীব। যাও তুমি এখান থেকে! কে তুমি দিলদার যে ঔরংজীবকে উপদেশ দিতে এসেছো ?

দিলদার। কে আমি ঔরংজীব ? আমি মির্জ্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ!

ঔরংজীব। নিয়ামৎ খাঁ হাজী!—এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামত খাঁ!

দিলদার। হাঁ ঔরংজীব, আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ; শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাকুরীতেও নেমেছি; কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলেই ছিল ভালো। ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কর্চ্ছিলাম ? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমি চল্লাম সম্রাট্!

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। জনাব!

দিলদার। আমায় ফেরাতে পার্ব্বে না ঔরংজীব!—আমি চল্লাম।

তবে একটা কথা বলে যাই। মনে ভাব্ছো যে এই জীবন-সংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে ? না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব। এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি।—অধঃপতন! তুমি যত ভাব্ছো উঠছো, সত্যসত্য তুমি ততই পড়ছো! তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন সাদা চোখে দেখ্বে, যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহাব্যবধান খনন করেছো, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠ্বে! মনে রেখো!

(প্রস্থান)

ঔরংজীব নতশিরে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

[(ক) **মূল বক্তব্য** :—ঔরংজীব একটির পর একটি পাপের অনুষ্ঠান করে সিংহাসন লাভ করেছেন কিন্তু নিজের বিবেককে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নি। হৃদয়ের মধ্যে বিবেকের দংশন তাঁকে বিনিদ্র রজনী ও নানা রকম উৎভট স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করাচ্ছে। দিলদারের কাছে এই স্বপ্নের কথা বলাতে দিলদার বলেছেন এগুলি বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি। এই দৃশ্যে তিনি দিলদারের আসল পরিচয়ও পেয়েছেন]।

(খ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন** :—

১। এই দৃশ্যে ঔরংজীব চরিত্র সম্পর্কে তোমার যে ধারণা হয়েছে ব্যক্ত কর।

২। দিলদার কে ? তার চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

(গ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** :—

১। "এ তোমার জয় নয়, এ তোমার পরাজয়"—কে, কাকে, কেন বলেছেন বল।

২। "বিবেকের যবনিকার উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি"—বলতে কি বুঝ, আলোচনা কর।

৩। "চিরকালটা পরকে ছলনা করে কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্ত্তে পারেন ?"—কে, কাকে, কেন এই কথা বলেছেন ?

(ঘ) **শব্দার্থ** :—তন্দ্রা—ঘুমের আবেশ ; কবন্ধ—মস্তকহীন অথচ স্বাভাবিক মানুষের মত ক্রিয়াশীল নরদেহ, ব্যতিক্রম—অন্যথা, বিদূষক—ভাঁড়।

(ঙ) **বাক্য রচনা** : নির্ম্মতায়, উপর্যুপরি, আচ্ছাদিত, বিস্তৃতম, আবর্ত্তের, শাদা চোখে।

Outward physical victory is less impor-
tant than moral victory.



মাটির চাঁদ

—রামপ্রসাদ সেন

কবি ও কবিতাপরিচিতি :—[সাধক রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতকের (১৭১৮-২৩ খৃঃ) প্রথম ভাগে চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহরের অন্তর্গত কুমারহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যথার্থ পরিচয় অসংখ্য আবেগমধুর সঙ্গীতের মধ্যে। ইনি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সাধক-কবি হিসাবে তাঁর বিশেষ পরিচয় রয়েছে। কবিতাটি "কালীকীর্তন" কাব্য হতে সংকলিত]।

গিরিবর, আর আমি পারি না হে
প্রবোধ দিতে উমারে!
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা—"ধ'রে দে উহারে।"
কাঁদিয়ে ফুলাল' আঁখি, মলিন ও-মুখ দেখি'
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
"আয়, আয়, মা, মা" বলি' ধরিয়ে কর—অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়— "চাঁদ কি রে ধরা যায়?"—
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।

উঠে বসে গিরিবর, করি' বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে,
সানন্দে কহিছে হাসি'— ধর, মা, এই লও শশী।"
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহা সুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে!

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

[(ক) মূলবক্তব্য :—উমা বায়না ধরেছেন তাঁকে চাঁদ ধরে এনে দিতে হবে। মা মেনকা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন চাঁদ ধরা কি এত সোজা! উমা কিছুই বুঝতে চান না। মেয়ের এই অবস্থা দেখে পিতা হিমালয় তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং একটি দর্পণ তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—"এই নাও চাঁদ।" দর্পণে নিজের ছবি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় উমা ভাবলেন আকাশের চাঁদ তাঁর হাতে ধরা পড়েছে।]

(খ) শব্দার্থ :—উমা—হিমালয়ের কন্যা, অপর নাম গৌরী; করঅঙ্গুলি —হাতের আঙ্গুল; ফুলালো আঁখি—কেঁদে চোখ স্ফীত হওয়া; শশী—চাঁদ; নিশি—রাত্রি; অবশেষ–অবসান; মুকুর—দর্পণ; গিরিবর—পর্বতশ্রেষ্ঠ; প্রবোধ—সান্ত্বনা।

(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও :—

১। কবিতাটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

২। উমা চাঁদ চেয়েছিল—দর্পণে নিজের মুখ দেখে খুশী হল কেন?

(ঘ) ব্যাখ্যা লেখ :—

১। "আমি কহিলাম তায় চাঁদ কিরে ধরা যায়–ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে"।

২। "মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ,—বিনিন্দিত কোটি শশধরে।"

(ঙ) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর :–করঅঙ্গুলি, অবশেষে, মুকুর, মহাসুখ।

(চ) শূন্যস্থান পূরণ কর :—
কাঁদিয়ে — আঁখি, মলিন — দেখি
মায়ে — সহিতে — পারে?

(ছ) কবিতাটি ভালভাবে মুখস্ত কর।

Father's affection towards his daughter

ব্যর্থ প্রয়াস

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি ও কবিতাপরিচিতি ঃ—[জন্ম ১৮২৬ খৃীঃ. মৃত্যু ১৮৮৭ খৃীঃ। আদি নিবাস হুগলী জেলার বাকুলিয়া গ্রামে। অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর "পদ্মিনী উপাখ্যান", "কর্মদেবী", শূরসুন্দরী" ও "কাঞ্চী কাবেরী" উল্লেখ্য গ্রন্থ। এই কবিতাটি "পদ্মিনী উপাখ্যান" কাব্য হতে সংকলিত হয়েছে]।

কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্ম দেহ চিত্র করে ?
করিলে কি বাড়ে তার শোভা
কিংবা সেই কোকনদে মাখাইলে মৃগমদে
অতি সুখ লভে মধুলোভা ?
কষিত কাঞ্চনকায় কিবা কার্য্য সোহাগায়
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কে হে দিবে ইন্দ্রধনু দেহে
অভিনব রূপরঙ্গ ঘটা !
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি প্রখর ভাস্বর-ভাতি
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গজমুক্তাফল রাজি ?
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

(ক) [মূলবক্তব্য ঃ—যা স্বভাবতই সুন্দর, তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যর্থ। কোন মূর্খ পদ্মকে চিত্রিত করলে তার কি শোভ বাড়ে, বা সেই পদ্মে কস্তুরী মাখালে কি ভ্রমরকে অধিক আকর্ষণ করে? বিশুদ্ধ স্বর্ণে পালিশের কোন প্রয়োজন হয় না, ইন্দ্রধনুতে রং মাখানোর চেষ্টাও মূর্খতারই পরিচায়ক। সূর্যের দীপ্তি বাড়াতে ঘি-এর বাতি জ্বালাবার প্রয়োজন নেই, গজমুক্তা স্বভাবতই দীপ্তিময়, এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য সিন্দুরে মাজবার দরকার নেই।]

(খ) শব্দার্থ :—মূঢ়—নির্বোধ ; কোকনদ—লালপদ্ম ; মৃগমদ—কস্তুরী, মধুলোভা—ভ্রমর ; কষিত—বিশুদ্ধ ; সোহাগা—ধাতু যোজন বিশেষ ; রসান—স্বর্ণাদির অলংকার পালিশ করবার শান ; গজমুক্তা—হস্তীকুম্ভজাত মুক্তা-বিশেষ ; কুম্ভ—হস্তী শিরস্থ মাংস পিণ্ডদ্বয়।

(গ) উত্তর দাও ঃ—

১। কবিতাটির মূলভাব অল্প কথায় ব্যক্ত কর।

২। গজমুক্তা নাম হলো কেন?

৩। 'হেন মূর্খ আছে কে হে দিবে ইন্দ্রধনু দেহে-অভিনব রূপরঙ্গ ঘটা'। —কেন কবি এরূপ কথা বলেছেন? পংক্তিটির অর্থ বিশ্লেষণ কর।

(ঘ) ব্যাখ্যা লেখ ঃ—

১। 'কষিত কাঞ্চন কায় কিবা কার্য সোহাগায়'।

২। 'কি কাজ সিন্দুরে মাজি গজমুক্তাফলরাজি'।

(ঙ) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ—

মূঢ়, মধুলোভা, ভাস্বর, দুরাশা, সমুজ্জ্বল

(চ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

— সেই — মাখাইলে —

— সুখ — মধুলোভা?

To carry coal to New castle

শিশুবীর



— গোবিন্দচন্দ্র দাস

কবি ও কবিতাপরিচিতি :—[জন্ম ১৮৫৫ খ্রীঃ মৃত্যু ১৯১৮ খ্রীঃ। ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কয়েকটি প্রধান কাব্যগ্রন্থের নাম 'কুসুম', 'কস্তুরী' 'প্রেম ও ফুল', 'বৈজয়ন্তী'। 'শিশুবীর' কবিতাটিতে শিশুর মহিমা ব্যক্ত করেছেন]।

এ নহে তৈমুরলঙ্গ চীন তাতারীর,
আসেনি হিমাদ্রি লঙ্ঘি' নাহি সৈন্য সাথী সঙ্গী
নাহি হাতে তরবার, নাহি ধনুতীর ॥
পথে পথে হাহাকারে আসেনি কাঁদায়ে কারে।
আসে নাই দেশে, দেহে বহায়ে রুধির !
আসিয়াছে পুষ্পরথে, সুমেরুর স্বর্ণপথে,
উড়ায়ে কনকরেণু কিরণে মিহির।

এদেশে এসেছে এক, দিগ্বিজয়ী বীর !
সে যাহার ধরে গলে হিমাদ্রি হলেও গলে,
বহে নেত্রে শতধারা সুধা জাহ্নবীর !
ও ক্ষুদ্র হাসির চোটে সাগর ফোঁপায়ে ওঠে
শিহরে নারীর বুক, স্তনে ঝরে ক্ষীর
কে জানে কিসের মোহ, নাহি যুদ্ধ নাহি দ্রোহ
আত্মসমর্পণে সবে আনন্দে অধীর !
এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর—
তার হামাগুড়ি দিতে কুলায় না পৃথিবীতে,
অতি ক্ষুদ্র আঙিনা সে ক্ষুদ্র পরিধির !
তার সে চরণ দাপে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে,
অতি ক্ষুদ্র ধরণী সে আকুল অস্থির !
প্রতাপ প্রভুত্ব তার নাহি বিশ্বে তুলনার
কি ছার লংকার সেই রাজা দশশির !
জুড়াইতে তার হিয়া শীতল পরশ দিয়া
আসিয়া রয়েছে আগে মলয় সমীর।
তাহারি পানের তরে নদী হ্রদ সরোবরে
নীরদ রেখেছে ভরি' সুশীতল নীর !

তারি আসিবার তরে রজত, সুবর্ণ করে—
উজলিয়া আছে ধরা শশাংক, মিহির !
তারি আগমন জন্য ধরণী হয়েছে ধন্য
আর কোন প্রয়োজন নাহি পৃথিবীর !
তুষিতে তাহারি মন বসন্তের ফুলবন
ফুটায়ে রেখেছে ফুল সুধা-সুরভির !
ফল শস্যে হয় নত তরুতৃণ আছে যত
পোষিতে অমৃত-খাদ্যে তাহারি শরীর !
তারি তরে আমি, তুমি, অনন্ত আকাশ, ভূমি—
সৃষ্টির গভীর অর্থ হয়েছে গভীর !
—এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর।

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

(ক) **ভাববস্তু :**—[শিশুর মত বীর আর কে আছে ? শিশু দুর্বল এবং কোমল তথাপি সে অতি সহজে, অনায়াসে সকলের মন জয় করতে পারে। সামান্য হাসি, মধুর কলকাকলি ও ভালবাসা দিয়েই সে বিশ্বজয় করতে পারে—সুতরাং এমন বিশ্বজয়ী বীর আর নেই।]

(খ) শব্দার্থঃ — রুধির — রক্ত ; মিহির — সূর্য ; জাহ্নবী — গঙ্গা ; দ্রোহ — বিদ্বেষ ; পরিধি — সীমা ; দশশির — রাবণ ; নীরদ — মেঘ।

(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ —

১। কবিতাটির সারাংশ লেখ।

২। শিশুকে 'দিগ্বিজয়ী বীর' বলা হয়েছে কেন ?

'সৃষ্টির গভীর অর্থ হয়েছে গভীর !' — উক্তিটি কি প্রসঙ্গে ? আলোচনা কর।

(ঘ) ব্যাখ্যা লেখ : —

১। "আত্মসমর্পণে সবে আনন্দে অধীর।"

২। "তারি তরে আমি-তুমি, সমস্ত আকাশভূমি সৃষ্টির গভীর অর্থে হয়েছে গম্ভীর।"

(ঙ) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ — সুশীতল, রুধির, নীরদ, কুলায়, আকুল।

(চ) পদ পরিবর্তন কর ঃ — শীতল, ধন্য, সুধা, শরীর, হিমাদ্রি।

The position of a Child in a family



নববর্ষের গান

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি ও কবিতাপরিচিতি ঃ—[জন্ম ১৮৬১ খৃঃ, মৃত্যু ১৯৪১ খৃঃ। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম থেকেই কবিতার প্রতি ঝোঁক। ছোটদের জন্য তিনি অনেক গল্প কাহিনী ও মজার মজার কবিতা লিখেছেন। ১৯১৩ খৃঃ এই কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার পান। এই কবিতাটি কবির "সংকল্প ও স্বদেশ" কাব্য হতে গৃহীত হয়েছে]।

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে শুন এ কবির গান—
তোমার চরণে নবীন হর্ষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি
এনেছি মোদের মনের ভকতি
এনেছি মোদের ধর্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান।
কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিক জুটে ;
যা কিছু মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন—
দীনের এ পূজা দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধুলা লুটে।
সুর দুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে।

রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয় ;
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি-বচন—
তাই আমাদের দিও।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমার উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র, দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব
মৃত্যুতরণ শংকাহরণ দাও সে মন্ত্র তব।

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূলবক্তব্য** :—[ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি, তাই জন্মভূমি আমাদের কাছে দেবতা এই দেবতার কাছে আমরা আমাদের শক্তি, ভক্তি, ধর্ম এমনকি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করি। পূজার আয়োজন সামান্য হলে ক্ষতি নেই, দেবতা প্রসন্ন হলে ভক্তের সব অভাব ঘুচে যাবে। আমরা পরের সাজসজ্জা ফেলে দিয়ে তোমার কাছে বৈরাগ্যের উত্তরীয় গ্রহণ করবো—অন্তরের সম্পদই হচ্ছে আসল সম্পদ। হে ভারত তুমি আমাদের অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত কর, তুমি অমৃত মন্ত্রে সঞ্জীবিত কর যাতে আমরা মরণজয়ী হতে পারি।],

(খ) **শব্দার্থ** :—**কাঞ্চনথালি** –স্বর্ণপাত্র ; **পর্ণপুট**—পাতার নির্মিত পাত্র ; **উত্তরীয়**—উড়নীয় ; **অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র, অমৃতমন্ত্র**—যে মন্ত্র বলে ভয়, শোক, মৃত্যু জয় করা যায়।

(গ) **প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ—**

১। কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ কর কয়েকটি লাইনে।

২। "দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব, দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র"—কোন্ প্রসঙ্গে বলেছেন। উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ কর।

৩। "ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়"—কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪। "রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস"—কাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে?

(ঘ) **ব্যাখ্যা লেখ ঃ—**

১। "দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন।"

২। "মৃক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।"

(ঙ) **সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ**—মহাতাপস, ভিক্ষাভূষণ, উত্তরীয়, অভয়-মন্ত্র, পর্ণপুটে, শঙ্কাহরণ।

Glories and greatness of India.



—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি ও কবিতাপরিচিতি ঃ—[জন্ম ১৮৭৭ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯৫৫ খ্রীঃ। নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে করুণানিধানের জন্ম হয়। সাক্ষাৎ রবীন্দ্রশিষ্যগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তাঁর রচিত কাব্যগুলির নাম "প্রসাদী", "ঝরাফুল", "শান্তিজল" ও "ধানদুর্বা"। আলোচ্য কবিতাটিতে পল্লীজীবনের প্রতি কবির আকর্ষণ ব্যক্ত হয়েছে]।

ছুটবো আমি সরল প্রাণে
পর্ণকুটীর হতে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুটবো আলিপথে।

বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুক তারাটি হাসবে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে!

এলিয়ে দেবো নগ্ন বাহু
গায়ের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাবো
ঢেউয়ের টলমলে ;

তুচ্ছ করে জোয়ার ভাঁটা
এপার ওপার সাঁতার কাটা
নাচবে আলো জলের বুকে
নীল আকাশের তলে।

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব নায়ে
মাঝ গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আদুল গায়ে ;

গাঙচীলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে,
ডাকবে চাতক 'ফটিক জল'
মেঘের ছায়ে ছায়ে।

শুনতে যাবো ভারত কথা
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গলবে মনঃ প্রাণ :

বনবাসের করুণ কথা
শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা,
ফিরবো ঘরে দুঃখ ভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মান।

সারাদিনের শ্রান্তি ভরা
শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্ন হারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব রাতে!

না ফুটিতেই উষার আঁখি
না ডাকিতেই ভোরের পাখী
ঝংকারিব—'জয় জগদীশ'
প্রাণের 'একতারা'তে। (সংক্ষেপিত)

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূল বক্তব্য** :—[কবি পল্লীর মুক্ত জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে কখনও ধাননাচানো মাঠের হাওয়ায়, আলোর পথে, ছুটোছুটি, কখনও জোয়ার ভাটা তুচ্ছ করে এপার-ওপার সাঁতার কাটা, কখনও নৌকায় পাল তুলে হাল ধরে বসে থাকা আবার কখনও বা মাঝ গঙ্গায় জাল ফেলে মাছ ধরার চেষ্টা—এই সবে তার গভীর আনন্দ। এছাড়া রামায়ণ মহাভারতের গান শুনে সারাদিনের ক্লান্তিতে রাত্রির গভীর ঘুম, ভোরের পাখী ডাকতে না ডাকতেই জাগরণ।]

(খ) **শব্দার্থ** :—**আলিপথে**—ক্ষেত্রসীমার পথ (আল) ; **উজান**—স্রোতের বিপরীত মুখে ; **ঢেউয়ের টলমলে**—ঢেউয়ের উচ্ছলতায় ; **আদুল**—অনাবৃত ; **স্বপ্নহারাঘুম**—গাঢ় নিদ্রা ; **ফটিকজল**—চাতকের ডাকের অনুকরণ শব্দ।

(গ) **প্রশ্নের উত্তর দাও** :—

১। কবিতাটির নাম "বাসনা" হলো কেন? কি কি বাসনা কবি এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন আলোচনা কর।

২। কবিতাটির মূলভাব বিশ্লেষণ কর।

৩। "বনবাসের করুণ কথা/শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা।"—এখানে কার কথা বলা হয়েছে? মনে ব্যথা পাওয়ার কারণ কি?

৪। কবিতাটি মুখস্থ বল।

(ঘ) **ব্যাখ্যা লেখ** :—

১। "বনবাসের করুণ কথা
শুনতে বুকে বাজে ব্যথা।"

২। "স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব রাতে।"

৩। "ঝঙ্কারিব—'জয় জগদীশ'
প্রাণের একতারাতে।"

(ঙ) **সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর** :—মিঠে, আদুল, উজান, ম্রিয়মান।

(চ) **কোনটি কোন পদ বল** :—আরাম, আঁখি, পাখী, জগদীশ, সীতা।

(ছ) **শূন্যস্থান পূরণ কর** :—

বুক — — ধরিব,
— তুলিব —
— গঙ্গায় — ফেলিব
— আদুল — — ;

(জ) **ভিন্নার্থক শব্দ লেখ তিনটি করে**—আঁখি, পাল, প্রাণ, রাত।

Desires of a village boy



রাখী-ভাই

—গোলাম মোস্তাফা

কবি ও কবিতাপরিচিতি :—[১৮৯৭ খৃীঃ যশোহর জেলার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে গোলাম মোস্তাফা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আধুনিক যুগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবি। এঁর রচিত—"রক্তরাগ", "খোশরোজ", "হাসনাহেনা", "সাহারা", "কাব্যকাহিনী" প্রভৃতি কাব্য বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। কবির "কাব্য কাহিনী" হতে এই কবিতাটি সংকলিত হয়েছে]।

বাহাদুর শা আসছে ধেয়ে ক'রতে চিতোর জয়
সঙ্গে নিয়ে বিপুল সেনাদল,
চিতোর-রাণী কর্ণাবতীর তাই জেগেছে ভয়—
রাজপুতানা আতঙ্কে টল্‌মল্‌।

কে আছে বীর এই ভারতে এমন মহাপ্রাণ—
চিতোরের এই দুর্দিন-সন্ধ্যায়
পার্শ্বে এসে দাঁড়ায় তাহার, রাখতে তাহার মান—
ব্যাকুল রাণী সেই সে ভাবনায়।

হঠাৎ তাহার পড়্‌ল মনে—বাদশা হুমায়ুন
উদার হৃদয় অদ্বিতীয় বীর,

বাহাদুরের চেয়ে তাহার শক্তি শতগুণ
রাখতে জানে মান সে রমণীর।

অনেক ভেবে অবশেষে হুমায়ুনের ঠাঁই
লিখল রাণী লিপি সে একখানা —
"আজ হ'তে বীর হ'লে তুমি আমার 'রাখী-ভাই'
শীঘ্র এসে বাঁচাও বোনের প্রাণ!"

দূতের হাতে লিপি, আর সে রাখী তার —
যাত্রাপথে বাহির হ'ল দূত,
উৎসাহ ও কৌতূহলের অন্ত নাহি আর—
অবাক সবাই, ব্যাপার যে অদ্ভুত!

বাদশা তখন বাংলাদেশে ছিলেন অনেক দূর
শেরের সাথে চল্‌ছে লড়াই তাঁর,
পাঠান-বীরের দর্প এবার না যদি হয় দূর
রাজ্য রাখাই হবে তাঁহার ভার!

এমনি কঠিন দুঃসময়ে কর্ণাবতীর দূত
হাজির হ'ল হুমায়ুনের পাশ,
লিপি দিল, আর দিল সেই রাঙা রাখীর সূত,
মুখে তাহার আনন্দ—উচ্ছ্বাস!

লিপি পেয়ে আত্মহারা হুমায়ুনের প্রাণ,
কী করিবে, ভেবেই নাহি পায়;—
শত্রুরে আজ ছেড়ে গেলেও চরম অকল্যাণ—
কিরূপে বা রাখীই ফিরান যায়!

একটি নারী দুর্দিনে আজ মাগছে শরণ তার —
'ভাই' বলে সে করছে আহ্বান,
সে আহ্বানে খুল্‌বে নাকি তাহার হৃদয় দ্বার?
সাড়া কি আজ দিবে না তার প্রাণ?

থাকুক শত বিঘ্ন-বাধা — বাদশাহী তার যাক,
তবু তাহার 'বোন' বাঁচানো চাই ;
হোক বাহাদুর স্বজাতি তা'র — হিন্দু 'বোনের' ডাক
শুনবে আজি মুসলিম তার 'ভাই'।

ক্ষান্ত করি' এক নিমিষেই যুদ্ধ-অভিযান
চিতোর পানে ছুটল হুমায়ুন ;
কোন অসীমের ডাক শুনে আজ চঞ্চল তার প্রাণ ?
একটি রাঙা রাখীর এত গুণ !

লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে লড়্‌ল এসে বীর—
কামান-গোলা ছুটল সে প্রচুর,
পড়্‌ল লুটে হাজার হাজার মুসলমানের শির,
বাহাদুরের দর্প হ'ল চুর।

চিতোর-ভূমি মুক্ত হ'ল, অমনি হুমায়ুন
চল্‌ল ছুটে বোনের খোঁজে তার ;
রাজপুরীতে উঠ্‌ল বেজে সুর যে অকরুণ —
কর্ণাবতী নাইক বেঁচে আর।

ব্যাকুল আশায় চেয়ে চেয়ে হুমায়ুনের পথ
কর্ণাবতী গুণ্‌ছিল দিনরাত,
অবশেষে ভাবল যখন বিফল মনোরথ—
জহর-ব্রতে ক'রল জীবন-পাত।

গভীর ব্যাথায় হুমায়ুনের স্বর সরেনা আর—
বোনের তরে ভাই কেঁদে আজ খুন,
এই জীবনে হ'লনাক দেখাই দু'জনার !
সেই বেদনায় ক্ষুব্ধ হুমায়ুন !

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূল বক্তব্য ঃ**—[গুজরাটের বাদশা বাহাদুরশা চিতোর আক্রমণ করলে চিতোরের রাণী কর্ণাবতী দিল্লীর বাদশা হুমায়ুনের কাছে রাখীসূত্র পাঠালেন বিপদে বোনকে সাহায্য করার জন্য। হুমায়ুন তখন বাংলাদেশে শেরখাঁয়ের সঙ্গে যুদ্ধে রত। রাখীসূত্র ও পত্র পেয়ে হুমায়ুন সমস্যায় পড়লেন। শেষপর্যন্ত তিনি কর্ণাবতীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন। বাহাদুর শাকে পরাজিত করে হুমায়ুন যখন রাণী কর্ণাবতীর সন্ধান করলেন তখন তিনি জানলেন কর্ণাবতী জহরব্রত পালন করে প্রাণ ত্যাগ করেছেন—তাঁর জন্য ব্যাকুল অপেক্ষা করার পর]।

(খ) **শব্দার্থ ঃ**—**রাখীভাই**—রাখীবন্ধের জন্য ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি ; **রাখী**—শ্রাবণী পূর্ণিমায় ডান হাতের মণিবন্ধে বন্ধনীয় রঞ্জিত মঙ্গলসূত্র ; **শের**—শের খাঁ—পরে শেরশাহ নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। **জহরব্রত**—শত্রুর হাত হতে ধর্মরক্ষার জন্য রাজপুত রমণীগণ বিষপানে অথবা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করতেন—তারই নাম 'জহরব্রত'। **অকরুণ** -যার করুণা নেই, অর্থাৎ নির্দয় বা নিষ্ঠুর।

(গ) **প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ**—

১। "রাখীভাই" কাহিনীটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

২। "একটি রাঙা রাখীর এতগুণ"—কথাটির অর্থ কি বল।

৩। রাণী কর্ণাবতী জহরব্রত পালন করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন কেন ?

৪। "গভীর ব্যাথায় হুমায়ুনের স্বর সরে না আর—" কেন হুমায়ুনের এই অবস্থা ? ঘটনাটি বিশ্লেষণ কর।

(ঘ) **ব্যাখ্যা লেখ ঃ**—

১। "একটি নারী দুদিনে আজ মাগছে শরণ তার—'ভাই' বলে সে করেছে আহ্বান।"

২। "কোন অসীমের ডাক শুনে আজ চঞ্চল তার প্রাণ ?
একটি রাঙা রাখীর এত গুণ।"

৩। "এই জীবনে হল নাক দেখাই দু'জনার !
সেই বেদনায় ক্ষুব্ধ হুমায়ুন !"

(ঙ) **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**—

ব্যাকুল — চেয়ে চেয়ে — পথ
— গুণছিল – –
— ভাবল — বিকল — —
— ব্রতে — জীবন – – !



বাঙলা মা

—কাজী নজরুল ইসলাম

কবি ও কবিতাপরিচিতি ঃ--[জন্ম ১৮৯৯ খ্রীঃ মৃত্যু, ১৯৭৬ খ্রীঃ। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই তিনি সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধের শেষে ফিরে এসে দেশের মুক্তি সংগ্রামে যশ লাভ করেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য তিনি বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত হন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ—"অগ্নিবীণা", "বিষের বাঁশি", "দোলন চাঁপা", "ছায়ানট" ইত্যাদি। সঙ্গীত রচনাতেও এঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। এটি যেমন সুন্দর কবিতা তেমনি সুন্দর গানও।]

আমার শ্যামলা-বরণ মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি দরী বনে মাঠে
প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।

ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মাকে—
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে
বৈরাগিনী বীণ বাজায়।

ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে এক্‌লাটি,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড়-মাটি ;
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে
করুণার সে বারি ছিটায়।

কাজলা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্মমুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে লয়ে' বাঘ ভালুক ;
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে
বেদের সাথে সাপ নাচায়।

নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকন ছাড়ি বাজছে যে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টীপটি প'রে সন্ধ্যাতারার !
উষার গাঙ্গে ঘট ভরিতে
যায় সে মেয়ে ভোর বেলায়।

হরিৎশস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে তার নূপুর বাজে
ভাটীর স্রোতে গায় ভাটিয়াল, গায়ে সে বাউল মাঠের মাঝে
গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাটে
কেঁদে কভু বুক ভাসায়।

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূল বক্তব্য** :—[বাঙলা মায়ের শ্যামল রূপ পর্বতে বনে, মাঠে ও প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। পল্লীগ্রামে সে ভীরু মেয়ের মত একলা ঘুরে বেড়ায়। কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে সে সর্বত্র করুণার জল বর্ষণ করে। বাঙলা মায়ের বিচিত্র রূপ। জগতের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তার রূপ প্রতিভাত। কখনও তার আনন্দময়ী মূর্তি, কখনও তার অশ্রুময়ী মূর্তি]।

(খ) **শব্দার্থ** : - **গিরিদরী** —পর্বত ও পর্বতের কন্দর (বিবর) ; **ঝারি**—জলপাত্র ; **অলিন্দে**—বারান্দায় ; **ভাটীর স্রোতে** —নিম্নগামী প্রবাহে ; **ভাটিয়াল, বাউল**—দুটিই খাঁটি বাংলা গানের রূপ।

(গ) **প্রশ্নের উত্তর দাও** :—

১। রচনাটিতে বাঙলা মায়ের কোন্ রূপের পরিচয় পাও, আলোচনা কর।

২। গংগাতীরে শ্মশান ঘাটে বাঙলা মায়ের কি রূপ ? আলোচনা কর।

৩। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(ঘ) **ব্যাখ্যা লেখ** :— ১। "ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে
রোদের সাথে সাপ নাচায়।"

(ঙ) **অর্থ লেখ** :—কাজল মেঘের ঝারি ; সাঁঝের অলিন্দে ; 'ভাটির স্রোতে গায় ভাটিয়াল।

Beauties and properties of Bengal

ফুলের ভাষা

—প্রিয়ংবদা দেবী

কবিতা ও কবি পরিচিতি ঃ—[জন্ম ১৮৭৯ খ্রীঃ। ইনি মহিলা কবিদের মধ্যে অন্যতমা। তাঁর রচিত কাব্যগুলির মধ্যে 'রেখা', 'পত্রপুষ্প', 'রেণু', 'কাব্যদীপালী', 'অংশু' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বিদুষী মহিলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। অনুভূতির গভীরতা, ভাবপ্রকাশের অপরূপতায় বাংলা গীতি কবিতার আসরে তাঁর বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। জড়-বস্তুরও প্রাণ আছে। কবি ফুলের ভাষা বুঝেছেন, ফুল আমাদের কাছে কি বলতে চায় তা ব্যক্ত করেছেন।]

রাঙা গোলাপের ফুল হাসিমুখে বলে
"হও নম্র, শুচি ও সুন্দর।"
সুসিত কমলগুলি সরসীর জলে
বলে, "হও ক্রমে শুভ্রতর।"
কনক-বরণ দীপ্ত ওই সূর্যমুখী
চেয়ে উর্দ্ধে নির্মল তপনে,
বলে "উচ্চে লক্ষ্য রাখ, প্রেমে হও সুখী
ধৈর্য্য ধর জীবনে মরণে।"
যূথিকার কলি বলে, "প্রীতি কর দান
ক্ষুদ্র হও, হ'য়ো না কৃপণ।"
শেফালি হাসিয়া বলে প্রফুল্ল বয়ান,
"হিম-বায়ু রবে কতক্ষণ ?"

এমনি কত না ফুল প্রতি দিন-রাতে
হাসি মুখে বলে কত কথা,
সবারে মিলায়ে যদি ভাবি একসাথে
পাই তবে দেবের বারতা।

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

(ক) মূল বক্তব্য ঃ—[কবির বক্তব্য—বিচিত্র ফুলের বিভিন্ন অর্থ যদি উপলব্ধি করা যায় তা হলে মনে হয়—এরা যেন দেবদূত, দেবতার বার্তা বহন করে মর্ত্যে এসে ফুটেছে। এদের কারও বাণী (গোলাপ) শুচি ও সুন্দর হও, কেউ বলে (সূর্যমুখী) ঊর্ধ্বে লক্ষ্য স্থির রাখো ; কেউ বলে (যূথিকা) নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দাও। আবার কেউ বলে (শেফালী) দুঃখের দিনে বিচলিত হয়ো না - সুদিন আসবে]।

(খ) শব্দার্থ ঃ—শুচি—পবিত্র ; সুসিত -অত্যন্ত শুভ্র ; সিত—সাদা ; বয়ান—মুখ ; হিমবায়ু—শীতের বাতাস ; কনকবরণ – সোনার মত বর্ণ যার।

(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ—

১। কবি এই কবিতায় বিভিন্ন ফুলের যে কথা ব্যক্ত করেছেন আলোচনা কর।

২। "সবারে মিলায়ে যদি ভাবি এক সাথে
পাই তবে দেবের বারতা।"

এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৩। সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর।

সূর্যমুখী, দীপ্তি, যূথিকার, শেফালি, হিমবায়ু, হও নম্র, শুচি সুন্দর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

কত — ফুল — — রাতে
— মুখে — — কথা,
— মিলায়ে — ভাবি —
— তবে — বারতা।

৫। পদ পরিবর্তন কর ঃ—

সরসী, দীপ্তি, নির্মল, শেফালি, জীবন।

Nature is the best teacher.



জীবন মন্ত্র

—মুরারিমোহন সেন

কবি ও কবিতা পরিচিতি :—[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। জীবনের সার্থকতা কোথায় ? বিভিন্ন উপমার সাহায্যে তা ব্যক্ত হয়েছে।]

চাঁদের মতই করো আলো বিতরণ —
ফুলের মতই শুদ্ধ সুরভি বিলাও ;
আপন-পরের ভেদ কোরোনা কখন
— সবারেই হৃদয়ের ভালোবাসা দাও !

গানে যদি সুর থাকে, কবিতায় ছন্দ ;
প্রাণে থাকে প্রেম প্রীতি, তবে আর ভয় কি ?
আপনাকে আপনাতে রেখো নাক বন্ধ —
শিলার বাধনে বাঁধা নদী কভু রয় কি ?

কাননে দেখেছ কোনো সূর্য্যমুখী ?
—সূর্য্যের নিশানায় তেমনি তাকাও !

লক্ষ্য উঁচুতে যার সেই হয় সুখী ;
সাগরের পানে চেয়ে তরণী ভাসাও !

॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥

(ক) মূল বক্তব্য ঃ[স্বার্থের সংকীর্ণ বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই প্রকৃত ধর্ম এবং তাতেই জীবনের সার্থকতা। এই আত্মোৎসর্গের মধ্যে আপন পরের কোন ভেদ থাকবে না। গানে সুর থাকলে লোককে মুগ্ধ করে তেমনি কবিতায় ছন্দ থাকলে কবিতাও পাঠকের মন জয় করে। নদী আপন বেগে চলে—জীবনের ক্ষেত্রে এই কথাই সত্য।]

(খ) শব্দার্থ ঃ—সুরভি—সুগন্ধ ; নিশানা—লক্ষ্য ; সূর্যমুখী—একটি ফুল।

(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও ;—

১। কবিতাটির নাম জীবন মন্ত্র কেন ? এখানে কোন্ মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে ?

২। "গানে যদি সুর থাকে; কবিতায় ছন্দ",—কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৩। জীবনের আদর্শ বলতে গিয়ে কবিতায় চাঁদ, নদী, ফুল, সূর্যমুখী ও সাগরের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে কেন ?

(ঘ) প্রসঙ্গ পূর্বক ব্যাখ্যা লেখ ঃ—

১। "শিলার বাঁধনে বাঁধা নদী কভু রয় কি ?"

২। "সাগরের পানে চেয়ে তরণী ভাসাও।"

Some idea ~~...~~ of the previous poem viz ...

ঠিকানা ?

ঠিকানা ? নাম·········

পোঃ··· ···

জেলা ··· ···

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি ও কবিতা পরিচীত :—[জন্ম ১৯২৬ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯৪৭ খ্রীঃ। জন্মস্থান কলিকাতা। পিতৃভূমি মাদারিপুর, ফরিদপুর। মাত্র ২০ বছর ইনি বেঁচেছিলেন কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি কবি প্রতিভার অসামান্য পরিচয় দেন। ছাড়পত্র, পূর্বাভাষ প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। কবির ব্যাক্তিগত মনের ঠিকানা এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে]।

ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু—
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাওনি ? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান ?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণকুটীর গড়ি।

আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি,
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাই নাকো পথ,
তাই তো পাথর নুড়িতে গড়ব
মজবুত ইমারত।

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে
আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে।

ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে
জেনো গচ্ছিত আছে। (সংক্ষিপ্ত)

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥

(ক) **মূল বক্তব্য :**—[এই কবিতার মধ্যে কবির আশাহত জীবনের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ঠিকানার অর্থ এখানে মুক্তির সন্ধান বুঝিয়েছেন। লেখক এদেশ থেকে এখনও মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাননি বলে তিনি কোন ঠিকানা জানাতে পারছেন না। তবে তিনি মুক্তির সন্ধান পাবেন এ বিশ্বাস তাঁর আছে। কবির ঠিকানা ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুশ ও চীনের কাছে গচ্ছিত আছে—অর্থাৎ তারা জীবনের যে পথ দেখিয়েছেন সেটাই তার পথ। তাঁর ব্যক্তিগত মনের ঠিকানা—ঐ দেশেরই চিন্তাধারা।]

(খ) **শব্দার্থ :**—ঠিকানা—সন্ধান ; সন্ধান—খোঁজ ; **পর্ণকুটীর**—কুঁড়ে-ঘর ; **যাযাবর** ভবঘুরে ; কুড়াই—সংগ্রহ করি ; মজবুত—শক্ত ; **ইমারত**—পাকাবাড়ি ; **সূর্যোদয়**—সূর্য ওঠার সময় ; **গচ্ছিত** সংরক্ষিত।

(গ) **উত্তর দাও :**—

১। কবিতাটির বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

২। কবি কি ঠিকানার সন্ধান পেয়েছেন ?

৩। কবি কোথায় বাস করেন ?

৪। 'যাযাবর' বলতে কি বুঝ ? কবি নিজেকে যাযাবর বলেছেন কেন ?

৫। কবি কি দিয়ে ইমারত গড়বেন ?

৬। কবির ঠিকানা কোথায় খোঁজ করব ? কার কাছে তাঁর ঠিকানা গচ্ছিত আছে নামগুলি উল্লেখ কর।

(ঘ) **সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর :**—ঠিকানা, সন্ধান, যাযাবর, মজবুত, ইমারত, গচ্ছিত।

(ঙ) **শূন্যস্থান পূরণ কর :—**

আমার — খোঁজ করো —
— পথে।
—, যুগোশ্লাভিয়া
— ও চীনের —
— ঠিকানা — ধরে
— গচ্ছিত —।

(চ) **একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে তার প্রয়োগ কর।**

	শব্দ	অর্থ	প্রয়োগ
১।	ঠিকানা		
২।	ঠিকানা		
৩।	ঠিকানা		
৪।	ঠিকানা		

(ছ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

Whereabouts of the have nots